



মূর্ছনা

www.murchona.com

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos

suman_ahm@yahoo.com

ছায়া অনুগামী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।



ইন্দ্রাণী ঘুরে দাঁড়াতেই মহিলাটি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর বেশ দ্রুত পায়ে পেরিয়ে গেলেন ট্রাম লাইন। যেন কিছু একটা চুরি করে পালাচ্ছেন। ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

যতই তুচ্ছ ব্যাপার হোক, তবু যদি তার ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তা হলে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। যতক্ষণ মানুষ জেগে থাকে, ততক্ষণ অনবরত নানারকম যুক্তি তাকে ঘিরে থাকে। অনেকটা মাধ্যাকর্ষণের মতনই এই যুক্তির চাপ। মাঝে মাঝে এই যুক্তির একঘেয়েমি মানুষের অসহ্য লাগে, তখন সে যুক্তি ভাঙতে চায়। যেমন মানুষ ফস করে আত্মহত্যা করে, কিংবা হঠাৎ অন্যের নামে একটা নিন্দে করে দেয়। কিন্তু একজনের এই যুক্তি ভাঙা অন্যরা মনে নেয় না, তারা তখন যুক্তি খোঁজে, কেন আত্মহত্যা করল, কেন অকারণে নিন্দে করল আর একজনের নামে?

ইন্দ্রাণীও এই মহিলার আচরণের কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। এই নিয়ে তিনবার ঘটনাটি ঘটল।

মহিলাটি প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার করে বার্ধক্যের কাছাকাছি এসেছেন

প্রায়। তবে শরীর খুব ভাঙেনি। ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রং মাজা মাজা। পরনের শাড়িটি সাদা, কিন্তু মলিন নয়, মাথায় আধখানা ঘোমটা, চুল সব পাকেনি, ওকে দেখলে দুঃস্থ বা অভাবীও মনে হয় না, বরং চশমা পরা চোখ দুটিতে মার্জিত রুচির ছাপ আছে। ইনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কেন? ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলাপ করতে চান? তা হলে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেন পালিয়ে যান চোরের মতন?

ইন্দ্রাণী প্রথম লক্ষ করেছিল দিন দশেক আগে গোলপার্কে একটি মিস্ট্রির দোকানের বাইরে। ইন্দ্রাণী এক বাক্স সন্দেশ কিনে বেরিয়ে আসছে, মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিলেন ফুলের দোকানের পাশে। ওঁর ব্যগ্র দৃষ্টি দেখে ইন্দ্রাণী প্রথমে ভেবেছিল, উনি বুঝি ইন্দ্রাণীর পেছনের কারুক দেখছেন। ইন্দ্রাণী মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন, সে রকম কেউ নেই। তারপর ইন্দ্রাণী এদিকে ফেরার আগেই মহিলাটি হাঁটতে শুরু করে দিয়েছেন।

ইন্দ্রাণী সেই প্রথমবার ধরে নিয়েছিল, মহিলাটি নিশ্চয়ই তাকে খুব চেনা কেউ বলে ভুল করেছেন। সে রকম হতেই পারে। ইন্দ্রাণী অবশ্য এ মহিলাকে জীবনে কখনও দেখেনি।

দ্বিতীয়বার দেখা বাসস্টপে। ইন্দ্রাণী তার মেয়েকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছে। বেশ ভিড় ছিল। তবু বোঝা যায়, শুধু একজনই ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে আছে স্থিরভাবে। এ বারেও কি তাঁর চেনা কেউ বলে ভুল করেছেন? কাছে এসে কথা বললেই তো পারতেন। পৃথিবীতে কোনও দুজন মানুষই একরকম হয় না, এমনকী সহোদর যমজদের হুবহু এক চেহারা মনে হলেও কিছু না কিছু সূক্ষ্ম তফাত থাকে। তবু পথে ঘাটে হঠাৎ হঠাৎ এক-একজন মানুষকে দেখে অন্য কারুর কথা মনে পড়ে যায়। গত বছর দিল্লি যাবার সময় গয়া স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ট্রেন, উল্টোদিকের আর একটা ট্রেনের জানালায় চোখ পড়তেই ইন্দ্রাণীর বুকটা কেঁপে উঠেছিল। নন্দুমামা! হাসি হাসি মুখে ইন্দ্রাণীকেই দেখছেন।

নন্দুমামা হতেই পারেন না, কারণ তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন দু' বছর আগে। তাঁর কোনও যমজ ভাই তো দূরের কথা, আর কোনও

ভাই-ই নেই। নিশ্চয়ই অন্য কোনও লোক, সকাল বেলাতেই এ রকম দৃষ্টি বিভ্রম। সেই ট্রেনটা তখনি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

মৃত কারুর বদলে জীবন্ত কারুর সঙ্গে চেহারার মিল খুঁজে পেলে বুক কাঁপার তো প্রশ্ন নেই। কাছে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে। অন্য একজন পুরুষ হলে তবু কিছুটা সঙ্কোচ হতে পারে, কিন্তু যদি একজন মহিলা হয়...

আজ ইন্দ্রাণীর বুক কেঁপে উঠেছিল। গাড়িয়াহাটের মোড়ে সে পেয়ারা কিনছিল। এই সময় বেশ স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল পেয়ারা ওঠে, দাম খুব বেশি না হলেও একটু দর কষাকষি করতে ভাল লাগে। ইন্দ্রাণী আগেই দেখতে পেয়েছিল, সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি একটু দূরে এসে দাঁড়ালেন। না দেখার ভান করে অনর্থক পেয়ারা বাছাবাছি করার সময় নিচ্ছিল ইন্দ্রাণী, আজ সে নিজেই মহিলাটির সঙ্গে কথা বলবে। তিনি আরও একটু কাছে এগিয়ে এলেন, ইন্দ্রাণী আড় চোখে দেখল, রাস্তায় এত মানুষ, তবু মহিলাটি শুধু তাকেই লক্ষ্য করছেন, যেন ইন্দ্রাণীর অস্তিত্বের মধ্যে তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন কিছু।

ইন্দ্রাণী কথা বলার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই মহিলাটি কোনও সুযোগই দিলেন না, ঠিক যেন পালাবার ভঙ্গিতে রাস্তা পার হয়ে মিশে গেলেন জনারণ্যে।

ইন্দ্রাণী পেয়ারা বিক্রেতাকে অবাক করে দিয়ে বলল, নাঃ থাক, আজ আর কিনব না!

তার বকের ভেতরটা দুর্বল হয়ে গেছে, তার ভয় করছে। একজন মহিলা তাকে অনুসরণ করছে, তার ওপর লক্ষ্য রাখছে, অথচ কাছে এসে কথা বলছে না। তা হলে নিশ্চয়ই অন্য কোনও মতলব আছে। আজকাল কত দিক থেকে কত রকম বিপদ আসতে পারে। একজন পুরুষ মানুষ এ রকম ভাবে তার পিছু নিলে সেটাও ভয়ের ব্যাপার হত, কিন্তু সেটা যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু এ মহিলাটি কী চায়?

ইন্দ্রাণীর জীবনে কোনও লুকোনো গোপন গুহা নেই, কেউ এসে কিছু ফাঁস করে দেবে, সে আশঙ্কাও নেই। স্বামী ছেলে-মেয়ে নিয়ে



তার স্বাভাবিক সংসার। অবিমিশ্র সুখের
হয়তো নয়, আবার অসহনীয়ও নয়। তবু এ র
কম সংসারেও হঠাৎ একটা উল্কা এসে সব
কিছু

তছনছ করে দিতে পারে।

দুপুরবেলা সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় ইন্দ্রাণীকে কাটাতে হয় গড়িয়াহাট ে
মাড়ের আশেপাশে। মেয়েকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরিয়ে
নিয়ে যাওয়া। মাঝখানের সময়টায় বাড়ি ফিরে গেলে যাওয়া আসাই
সার হয়, তা ছাড়া যদি কোনও কারণে ফিরে আসতে দেরি হয়, সে
ঝুঁকি নিতে চায় না ইন্দ্রাণী। ভাল স্কুলে ছেলে-মেয়েদের পড়াবার
জন্য তার মতন আরও অনেক মা দূর দূর থেকে আসে। সাড়ে তিন
ঘণ্টা সময় এখানেই কাটিয়ে দেয়। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না,
দোকানে দোকানে ঘোরা যায় না প্রত্যেক দিন, তাই অনেক মা
ফুটপাথেই বসে পড়ে কাগজ পেতে, রাস্তার এখানে-সেখানে জমা
জলের মতন অনেক তরুণী মায়েদের ছোট ছোট ক্লাব। ইন্দ্রাণী অবশ্য
সে রকম কোনও ক্লাবে যোগ দেয়নি। পরমেশ্বর এক বন্ধু একদিন
বলেছিল, আহা, কী চমৎকার শিক্ষা ব্যবস্থা, মায়েদের একেবারে
পথে বসিয়ে ছেড়েছে।

ইন্দ্রাণীর অবশ্য একটা সুবিধে ছিল। পূর্ণ দাস রোডে তার বান্ধবী
সুপর্ণার বাড়ি, খুব বেশি দূর নয়। সুপর্ণা অবশ্য চাকরি করে, দুপুরে
বাড়িতে থাকে না, কিন্তু তার শাশুড়ি আর ননদ আছে, ওদের সঙ্গে
গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। সুপর্ণা খুব উৎসাহের সঙ্গে
বলেছিল, তুই রোজ আসবি। ইচ্ছে করলে চা বানিয়ে খাবি, কিংবা
খানিকটা ঘুমিয়ে নিবি, টিভিও দেখতে পারিস। কোনও অসুবিধেই
থাকার কথা নয়, সুপর্ণাদের তিনখানা ঘরের বড় ফ্ল্যাট। ইন্দ্রাণী প্রায়ই
সুপর্ণার শাশুড়ির জন্য কিছু মিষ্টি বা ফল-টল কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু
মাস দেড়েক পরেই সেখানে যাওয়া বন্ধ করতে হল ইন্দ্রাণীকে।
কোনও ঘটনা ঘটেনি, সুপর্ণা বিস্মিত হয়ে ফোনে জিজ্ঞেস করেছিল,
তুই আর আসিস না কেন? ঠিক কোনও উত্তর নেই। কেউ খারাপ
ব্যবহার করেনি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে। সে কোনও অভিযোগও করতে পার

বে না। শুধু সে অনুভব করত, সুপর্ণার নন্দ হিমালী তার এ রকম প্রতিদিন আসা পছন্দ করছে না।

হিমালী মুখে তো কিছু বলেইনি, আকারে ইঙ্গিতেও কিছু বোঝায়নি, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সে সহজভাবেই কথা বলে। হিমালীর এখনও বিয়ে হয়নি, কেন হয়নি তা ইন্দ্রাণী জানে না। হয়তো সে বিয়ে করতে চায় না, বর্ধমানে একটা স্কুলে চাকরি করত, সেখান থেকে চলে এসেছে, ভাল লাগেনি বোধহয়, এখন সে বাড়িতেই থাকে। ইন্দ্রাণীকে তার অপছন্দ করার আপাত কোনও যুক্তিই নেই, দুজনের জীবনের পথ কখনও কাটাকুটি হয়নি। হিমালীর নিজস্ব একটা ঘর আছে, ইন্দ্রাণী শুধু ওদের বসবার ঘরটার সীমা ছাড়িয়ে আর কোথাও যায় না। তবু, ইন্দ্রাণী এসে বেল বাজালে হিমালীই দরজা খোলে, কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মুখের হাসিটা মুছে যায়, তারপরই সে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বলে, এসো, ইন্দ্রাণীদি, এসো এসো! সাড়ে তিনটে বাজলে হিমালীই তাকে চা বানিয়ে দেয়। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য ওই যে হাসিটা মুছে যাওয়া, তা নিয়ে কি অভিযোগ করা যায়? মানুষকে সব সময় হাসতেই বা হবে কেন? অতিথিদের সামনে সব সময় হাসি হাসি মুখ করে থাকাও তো কৃত্রিম ব্যাপার। কিন্তু দিনের পর দিন হিমালীর ওই কয়েক পলকের গাভীর্য দেখতে দেখতে ইন্দ্রাণীর মনে হয়, হিমালী যেন তাকে দেখেই ভাবে, আবার আজ এই মেয়েছেলেটা জ্বালাতে এসেছে! দুপুরটা একটু নিরিবিলিতে থাকা যাবে না!

এটা কি ইন্দ্রাণীরই বোঝার ভুল! পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সে ইচ্ছে করে দু' দিন বাদ দিয়ে আবার গেল। সেদিন হিমালী দরজা খুলে কয়েক মুহূর্তের জন্য হাসি মুছে ফেলল, তারপর বলল, এসো এসো। কিন্তু একবারও সে জিজ্ঞেস করল না, কাল-পরশু এলে না কেন? হিমালীর মা বরং উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, জ্বর-টর হয়েছিল নাকি? তখন হিমালী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অন্য দিকে।

তারপর থেকে ইন্দ্রাণী আর যায় না, হিমালীর কী অসুবিধে হচ্ছিল, কেন তাকে পছন্দ করতে পারেনি, তা নিয়ে ভেবেছে বেশ কয়েকদিন। দুপুরবেলা বসবার ঘরে একটুখানি জায়গা দিয়ে যে ইন্দ্রাণীর অনেকখানি উপকার করা হচ্ছিল, তা কেন সহ্য করতে পারল না হিমালী?

এখন হিমালয়ের চিত্তা ঘুচে গিয়ে বারবার মনে পড়ছে এই অচেনা
প্রৌঢ়ার কথা। ইনি কী চান? ওর ওই উন্মুখ দৃষ্টির মানে কী?

আজ সন্ধ্যাবেলা পরমেশকে সব কথা না জানিয়ে পারল না।

অফিস থেকে ফিরেই পরমেশ স্নান করে সাদা পাঞ্জাবি ও পাজামা
পরে নেয়। এই সময়টায় সে হালকা মেজাজে থাকে, টেলিফোন ধরে
না, সেলফোন অফ করে রাখে, কেউ দেখা করতে এলে ফিরিয়ে
দেয়।

ইন্দ্রাণীর কাহিনীটি শুনে সে প্রথমে হা হা করে হাসতে গিয়ে বিষ
ম খেল। তারপর হুইস্কির গেলাসে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বলল,
হায় হায়, তোমার এই অবস্থা হল রানি? কোথায় পুরুষরা তোমার
পিছনে ছোঁক ছোঁক করবে, তার বদলে একটা বুড়ি?

ইন্দ্রাণী বলল, ঠিক বুড়ি বলা যায় না।

পরমেশ বলল, সে যাই-ই হোক। একজন মেয়েমানুষ! কুটুনি নাকি?
তোমাকে তো বলেছি, দুপুরের দিকে একটা আলাগা গোছের প্রে
ম করো।

— দুপুরে প্রেম? বেকার ছাড়া দুপুরে কেউ বাড়ি থাকে?

— বেকাররাই বরং দুপুরে বাড়িতে থাকে না। কারা থাকে জানো,
যারা ছবি আঁকে, বই লেখে, গান গায়, এরাই বেশি প্রেমিক টাইপের
হয়! তোমার দাদার এক বন্ধু অরুণেশ ছবি আঁকত না? বেশ নাম-টা
ম হয়েছে।

— সে দু'বার বিয়ে করেছে।

— ওরে বাবা, যে দু'বার বিয়ে করতে পারে, তার তৃতীয়বারেও
আপত্তি হবার কথা নয়। চম্ফলজ্জা চলে যায়।

এ সব রঙ্গ-রসিকতার শেষে পরমেশ হঠাৎ
গম্ভীর হয়ে বলল, দমদমে ফ্ল্যাট কেনার স
ময় তুমিই তো বলেছিলে, ঠিক পারবে ি
মষ্টিকে স্কুলে দিতে-নিতে। কেন, এদিকে

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নেই? শুধু শুধু অত
দূরে...



— তা বলে এই বছরটা তো অন্তত...

— তুমি মেট্রোতে ফেরো। ওই বুড়িটা কি তোমার সঙ্গে কখনও এক
ট্রেনে উঠেছে?

— না বোধহয়। দেখতে পাইনি।

— লক্ষ রাখবে, বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে কি না। বাড়ি চিনে গিয়ে
যদি অন্যদের খবর দেয়... কার কী মতলব কিছু বোঝার উপায় নেই।

এরপর কয়েকটা দিন ইন্দ্রাণী সব সময় এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়েও
মহিলাটিকে দেখতে পায়নি। না দেখলেও উৎকর্ষা যায় না। যদি
মহিলাটি ইন্দ্রাণীকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দেয়, তা হলেও প্রশ্ন
থাকবে, কেন বন্ধ করল?

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে বাঁধ ভাঙা বার্নার
মতন, রাস্তার এ পাশে সব মায়েরা।

পরমেশ অফিসের কাজে দিল্লি গেছে বলে এখন দু' দিন স্বামীর
গাড়িটা পাচ্ছে ইন্দ্রাণী। গাড়ি থাকলে দুপুরের কয়েকটা ঘণ্টা চোখের
নিমেষে উড়ে যায়। নিউ আলিপুরে দেখা করে আসা যায় ছোটমাসির
সঙ্গে। ঘুরে আসা যায় এ সি মার্কেট। পূর্ণ দাস রোড দিয়ে অকারণে
যায় দু'বার, যদি হিমালীর চোখে পড়ে। এই সব দিনে ইন্দ্রাণী
ফুটপাথের ক্লাবের তরুণী মায়েদের দিকে তাকায় না।

গার্গী নান্নী আর একটি তরুণী প্রতিদিনই গাড়ি পায়। আজ ইন্দ্রাণী
এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। যারা গাড়িতে আসে তারা অন্যদের না
ম ধরে ডাকে না সরাসরি। তারা মিসেস বোস, মিসেস চ্যাটার্জি, মি
মসেস দত্ত। শুধু একটা গাড়ি থাকলেই তো হয় না, তার কিছু কিছু

আনুষঙ্গিক লাগে। বাড়ি থেকে বেরতে হলেই পারফিউম মাখতে হয়। শাড়ি-ব্লাউজ ম্যাচ না করলে চলে না। যেন কাজের মেয়ে মনে না হয়।

আকাশ বেশ মেঘলা, যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামবে। গাড়িটা পেয়ে আজ ইন্দ্রাণীর খুব সুবিধে হয়েছে, নইলে ট্যাক্সি নিতে হত। সামনের সপ্তাহে মিষ্টির পরীক্ষা। বৃষ্টিতে ভেজার কোনও প্রস্নই ওঠে না।

ছেলেমেয়েদের কলকাকলি ছাপিয়ে যায় নানারকম গাড়ির হর্ন। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বাস, এক-একটা বাস ভর্তি হয়ে গেলেই শুরু হয় ইঞ্জিনের গর্জন। যাদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে পড়ে না, এখন বেশ কিছুক্ষণ তাদের এ রাস্তায় প্রবেশ-অধিকার নেই।

গার্মী বলল, মিসেস দত্ত, গোটের কাছে ওই যে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, ওকে লক্ষ্য করেছেন? মাথায় আধখানা ঘোমটা, মাদার টেরিজার মতন। উনি মাঝে মাঝেই এসে ওইখানটায়— বাট আই হ্যাভ নোটিস্‌ড, উনি কোনও বাচ্চাকে নিতে আসেন না, এমনিই, ভেরি স্টেইঞ্জ।

ইন্দ্রাণীর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। এই তো সেই মহিলা! ইনি এখানেও... কী চান? আজ কথা বলতেই হবে।

আজ মিষ্টি বেরতে দেরি করছে। অনেক ছেলেমেয়েই বেরিয়ে এসেছে, গার্মী তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল, আধ-ঘোমটা মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন এখনও। ইন্দ্রাণী আর অন্য কোনও দিকে তাকাচ্ছে না।

মিষ্টির চুলের রিবন দেখা যেতেই ইন্দ্রাণী প্রায় দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে এল। মহিলাটি নিশ্চয়ই তাকে আগে দেখতে পাননি, তাই পালাবার উপক্রম করলেন না, প্রায় একেবারে মুখোমুখি।

মহিলাটিই প্রথম কথা বললেন। খানিকটা ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এই বুঝি তোমার মেয়ে? বাঃ, কী সুন্দর মুখখানি, লক্ষ্মীশ্রী আছে।

তিনি মিষ্টির মাথায় হাত রাখলেন।

ইন্দ্রাণী বলল, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

মহিলাটি বললেন, না না, আমায় চিনবে কী করে...

মিষ্টি মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বলল, মা, আজ পেন্সিল বাক্সটা হারিয়ে ফেলেছি, তুমি যে দশটা টাকা দিয়েছিলে, সেটাও ওর মধ্যে...

মুহূর্তে মনোযোগ সরে গেল, ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করল, সে কী, কী করে হারালি?

মিষ্টি বলল, পাশেই তো রেখেছিলাম, এর আগে শম্পারও একদিন হারিয়েছে।

ইন্দ্রাণী এবার মুখ তুলে দেখল, মহিলাটি এর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

এবার মিষ্টির ওপর তার বেশি রাগ হল। সামান্য একটা পেন্সিল বাক্স হারিয়েছে, সে কথা একটু পরে বলতে পারল না? কিছু হারাবার কথা শুনলেই—

ইন্দ্রাণী খোঁজার চেষ্টা করল, এত গাড়ির ভিড়ের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না।

মিষ্টি জিজ্ঞেস করল, এই আন্টিটা কে মা?

ইন্দ্রাণী ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, জানি না! বৃষ্টি এসে গেছে, তাড়াতাড়ি চল।

গাড়িতে উঠতে না উঠতেই পড়তে লাগল বড় বড় ফোঁটা। এমনিতেই এ সময় গাড়িগুলো জট পাকিয়ে যায়, বৃষ্টি নামলে আরও বেশি জ্যাম হবেই। এই সময় ড্রাইভাররা এত হর্ন বাজায়! সেটাই ইন্দ্রাণীর অসহ্য লাগে।

মিষ্টি আবার পেন্সিল বক্সের প্রসঙ্গ তুলতেই ইন্দ্রাণী তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর।

ড্রাইভারকে বলল, একটু পূর্ণ দাস রোড দিয়ে ঘুরে চলো। ওখানে একটা দোকান থেকে নোনতা বিস্কুট কিনতে হবে।

বকুনিতে লান না হয়ে মিষ্টি বলল, ওই দোকানে কিটক্যাট পাওয়া যায়।

পূর্ণ দাস রোড থেকে কেনা একরকম নোনতা বিস্কুট পরমেশ্বর খুব পছন্দ হয়েছিল। সে বিস্কুট যে পৃথিবীর আর কোনও দোকানে পাওয়া যায় না তা নয়। এমনকী নাগেরবাজারের এক দোকানেও দেখেছে ইন্দ্রাণী। তবু সে পূর্ণ দাস রোডে আসে, যেদিন গাড়ি থাকে। তার আসল ইচ্ছেটা, যদি হিমালয়ের সঙ্গে একবার দেখা হয়ে যায়। আর কিছু না, হিমালয়ের সঙ্গে হেসেই কথা বলবে সে, তারপর গাড়িতে উঠে পড়বে।

হিমালয়ের সঙ্গে নয়, দেখা হল সেই মহিলার সঙ্গে। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছেন গোলপার্কের পাশ দিয়ে।

ইন্দ্রাণী ব্যস্ত হয়ে ড্রাইভারকে বলল, এইখানে থামাও তো। থামাও।

গাড়ি থেকে নেমে এসে ইন্দ্রাণী বলল, আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন!

মহিলাটি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললেন, না, এই দিকেই...

ইন্দ্রাণী বলল, বৃষ্টিতে ভিজছেন! এই অসময়ের বৃষ্টি, ইস এর মধ্যেই তো কাপড়টা ভিজে গেছে। চলুন, আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।

মহিলাটি বললেন, না না, তার দরকার নেই। আমি হেঁটেই যাই।

ইন্দ্রাণী তবু জোর দিয়ে বলল, এ রকম ভাবে ভেজার কোনও মানে হয়? আপনার এই বয়সে— মহিলার আপত্তি সে গ্রাহ্য করল না।

গাড়িতে তোলার পর জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় থাকেন?

— যোধপুর পার্ক। তোমার অসুবিধে হবে।

— আমি কোথায় থাকি আপনি জানেন?

— না, তা কেমন করে জানব?

— আমার কোনও অসুবিধে হবে না। মেয়ে চকলেট খাচ্ছে, এখন ওর খিদেও পাবে না।

— কী সুন্দর মেয়ে। আমারও এই বয়েসী একটি নাতনি আছে।

— তাই বুঝি? সে কোন স্কুলে পড়ে?

উত্তর না দিয়ে মহিলাটি জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে।
বৃষ্টির তেজ কমেনি, রাস্তা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে।



মহিলাটির গলার আওয়াজ শুনেই ইন্দ্রাণী বুঝেছিল, ঐর সম্পর্কে খারাপ সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না। পোশাক দিয়ে পরিচয় গোপন করা যায়, কিন্তু মানুষের সামাজিক অবস্থান বোঝা যায় তার কণ্ঠস্বরে। আবার মুখ ফিরিয়ে মহিলা বললেন, কোন স্কুলে

পড়ে তা তো জানি না। এ দেশে থাকে না, সুইডেনে থাকে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করল, আমার মেয়ের সঙ্গে বুঝি তার চেহারার মিল আছে?

মহিলাটি ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললেন, না গো, মিল কী করে থাকবে, তার মা মেমসাহেব। নাতনিটিও সে রকমই হয়েছে। আঁমি অনেকদিন তাকে দেখিওনি। দেশে তো আসে না। ছেলের বউয়ের খুব গরম লাগে। একবার কলকাতায় এসে সব সময় খারাপ গন্ধ পেয়েছিল, তাই আর আসতে চায় না। ছেলেরও ইচ্ছে নেই, আসবেই বা কেন...

এর মধ্যে কোনও পারিবারিক ট্রাজেডির গন্ধ পেয়ে ইন্দ্রাণী চুপ করে গেল। এরপর কিছু জানতে চাওয়া ভদ্রতাসম্মত নয়।

তবু কৌতূহল যায় না। এখনও অনেকগুলো ‘কেন’র উত্তর পাওয়া যায়নি। তাই ইন্দ্রাণী প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যাচ্ছে, আপনার সঙ্গে আগে কি আমার কখনও পরি

চয় হয়েছিল ?

মহিলা বললেন, পরিচয়, না, হয়নি তো। তুমি বোধহয় আমাকে আগে কখনও দেখেনি। আমি একবার, অনেকদিন আগে, সে সব কিছু না...

তারপর পুরোপুরি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, আমার মাথার দোষ আছে, তাই না ?

ইন্দ্রাণী বলল, যাদের মাথায় দোষ থাকে, তারা তা টের পায় না। নিজের মুখে বলেও না।

মহিলা বললেন, আমাকে এই মোড়ের মাথায় নামিয়ে দাও।

ইন্দ্রাণী বলল, এখানে ? আপনার বাড়িটা ঠিক কোথায় ? সেখানেই নামিয়ে দেব।

মহিলা ব্যস্ত হয়ে বললেন, খুব কাছেই, আমি হেঁটে চলে যাব। বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না, তোমাদের আবার গাড়ি ঘোরাতে হবে।

এটা কি মহিলার অতিরিক্ত ভদ্রতা, নাকি বাড়িটা দেখাতে চান না। যারা বাড়ি দেখাতে চায় না, তাদের নিশ্চিত কিছু গুপ্তগোল থাকে। ইন্দ্রাণীর ভুরু কুঁচকে গেল না, কিন্তু সে রকমই একটা কিছু হল মনের মধ্যে।

সে বলল, এ আর এমন কী অসুবিধে হবে। আপনাকে একদম বাড়ির কাছে নামিয়ে দেব।

মহিলা বললেন, না না, আমি এখানে কিছু কেনাকাটা করব।

ইন্দ্রাণী জোর দিয়ে বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে আপনাকে কেনাকাটা করতে হবে না। এই সময় কেউ বৃষ্টিতে ভেজে ?

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে। মহিলা এমনভাবে সিটে হেলান দিলেন, যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। কিন্তু কোন বাড়ি, তা তো ওঁকেই দেখাতে হবে।

আবার দু' মিনিট বাদেই মহিলা চোখ খুলে বললেন, এইখানে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞেস করল, কোন বাড়িটা?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে মহিলা হাসলেন। তারপর বললেন, এ মনিতে আমি কারকে দেখাতে চাই না। কে কী না কী ভাববে। ওই যে দরজা।

সে বাড়ির ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'শান্তি নীড়। সবুজ সমিতি পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রম।'

মিষ্টি বানান করে করে নামটা পড়ল। কেন যেন ইন্দ্রাণী চুপসে গেল হঠাৎ, তার মুখটা লুকোতে ইচ্ছে করল এই মহিলার কাছ থেকে।

মহিলাটির মুখের হাসিটি এখন একটি দুষ্ট বালিকার মতন। তিনি গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, দুপুরবেলা এখান থেকে বেরুনো বারণ। আমি প্রায়ই পালিয়ে যাই, এরা বকে। কিন্তু আমার যে দুপুরবেলা অসহ্য লাগে। পাগলা-গারদ তো নয়, বলো, আমি ম নিজে নিজে ঘোরাফেরা করতে পারি, তাতে কি দোষ হয়? সব সময় কি বুড়োবুড়িদের দেখতে ভাল লাগে। আমার জীবনটা...

গাড়ি থেকে নেমে তিনি কাতর আন্তরিকতার সঙ্গে ইন্দ্রাণীকে বললেন, তোমাকে কী ধন্যবাদ দেব, তোমাকে দেখলে—

তার পরেই হাসিমুখটা মুছে গিয়ে তাঁর দু' চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। তিনি ধরা গলায় বললেন, আমি মনোজের মা।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে তিনি চলে গেলেন বৃদ্ধাশ্রমের বন্ধ দরজার দিকে।

ছায়া অনুগামী

সমরেশ মজুমদার



মনোজের মা ! কে মনোজ ? মনোজ নামের কাউকে কখনও
দেখেছে বা কারও কাছে ওই নাম শুনেছে বলে মনে পড়ছে না
ইন্দ্রাণীর। মনোজ নামে একজন ক্রিকেটার অথবা হিন্দি ফিল্মের
অভিনেতার কথা মনে এল কিন্তু তাঁরা তো কাছের দূরের কথা,
কাছাকাছিও নয়। তাঁরা কেউ বাঙালিও নয়। পরমেশ্বরের কোনও বন্ধু
বা আত্মীয়ের ওই নাম ? না, ইন্দ্রাণী মাথা নাড়ল।

‘মা, তুমি মনে মনে কথা বলছ?’ রিন্টি পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করল।

মেয়ের দিকে তাকাল ইন্দ্রাণী, ‘কে বলল?’

‘তোমার ঠোঁট নড়ছিল কিন্তু তুমি কথা বলছিলে না!’ রিন্টি জানাল।

‘দূর!’ হাসল ইন্দ্রাণী।

বৃষ্টি পড়ছে। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, এবার কোথায় যাবে। ইন্দ্রাণী
বলল, ‘সোজা বাড়ি।’

রিন্টি মাথা নাড়ল, ‘মা মা, বৃষ্টির মধ্যে একটু ঘুরব।’

‘না। বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে পড়া নিয়ে বসতে হবে।’ ইন্দ্রাণী বলল।

‘তা হলে একবার নিউ মার্কেটে চলো। পেপিল বক্স কিনব।’

কথাটা মনে ধরল ইন্দ্রাণীর। পাড়ার দোকানে সব সময় ভাল জিনিস পাওয়া যায় না। সে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতেই রিন্টি খুশি হল। বলল, ‘তুমি আমাকে বলো অচেনা লোকের সঙ্গে কথা না বলতে, কিন্তু তুমি কেন বললে?’

‘ওমা! কোথায় বললাম?’ মেয়ের খইফোটা কথাগুলোতে বাধা দেয় না ইন্দ্রাণী।

‘তখন তুমি বললে ওই আন্টিটাকে তুমি চেনো না। আবার তাকেই তুমি গাড়িতে তুলে নিলে। আন্টিটা যদি বন্দুক বের করে বলত তো মাদের যা আছে সব দিয়ে দাও, কী হত!’

চুপচাপ মেয়ের মুখের দিকে তাকাল ইন্দ্রাণী। ছদ্ম আতঙ্কের অভিব্যক্তি সেখানে। এটা পরমেশ্বরের দান। প্রায়ই ভয় দেখায়, বাইরের দরজায় বেল বাজলেই খুলবে না। যাচাই করবে। নইলে ঘরে ঢুকে বন্দুক দেখিয়ে বলবে সব দিয়ে দাও। মেয়েকে টিভির সামনে বসতে দেয় ইন্দ্রাণী ভেবেচিন্তে। তাই ইচ্ছে থাকলেও ও জেগে থাকলে টিভি খোলাই হয় না। ইন্দ্রাণী মেয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। বোঝাল, ঠিক ঠিক!

বাইরে গেলে পরমেশ্বর রোজ রাত সাড়ে নটায় ফোন করে। আজও করল। দু-একটা কাজের কথা বলার পরে ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা, তুমি মনোজ নামের কাউকে চেনো?’

‘মনোজ? কী করে?’ পরমেশ্বরের পাল্টা প্রশ্ন।

‘আহা! কী করে জানলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন? শ্রেফ মনোজ নামটা শুনে কারও কথা কি মনে পড়ছে তোমার?’ ইন্দ্রাণী বোঝাবার চেষ্টা করল।

‘মনোজ! মনোজ! হ্যাঁ। আমার সঙ্গে পড়ত কলেজে। এখন সে মলবোর্নে থাকে।’

‘তার মা কোথায় থাকেন?’

‘দাঁড়াও দাঁড়াও। সেই মনোজের মাথা কলেজে পড়ার সময় কামানো হয়েছিল। বলেছিল ওর মা মারা গিয়েছে। শুনে সহানুভূতি দেখিয়েছিলাম আমরা। কেন বলো তো?’

‘না। এ সেই মনোজ নয়।’

‘কী হয়েছে বলবে তো?’

‘বলব। তুমি ফিরে এসো, তারপর।’

‘সাসপেন্স তৈরি করছ?’

‘দূর! এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয় বাবা।’ হেসে ফেলেছিল ইন্দ্রাণী।

ফোনে ওই ভাবে কথা বললেও মন শান্ত হয় না। রিন্টি ঘুমিয়ে পড়লেই ভাবনাগুলো ফিরে এল। এই প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা থাকেন বৃদ্ধাশ্রমে। তার মানে কলকাতায় ওঁর কোনও আত্মীয় নেই অথবা থাকলেও তারা মহিলাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই মহিলার ছেলের নাম মনোজ। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও দুপুরে প্রায়ই বেরিয়ে পড়েন লুকিয়ে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হাঁপিয়ে ওঠেন। একাই রাস্তায় ঘোরেন। তার মানে এখনও মন সজীব আছে। সবুজ সমিতি পরিচালিত ওই বৃদ্ধাশ্রমের নাম শান্তি নীড়। বাড়িটার চেহারা দেখে, অন্তত বাইরে থেকে যতটুকু দেখা গেছে, মনে হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমটির মান বেশ উঁচুতে। হঠাৎ মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। এখন রাত সাড়ে নটা। ফোন করার পক্ষে খুব বেশি রাত নয়। ইন্দ্রাণী টেলিফোনের মোটা বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড খুলে শান্তি নীড় খুঁজতে লাগল। খুদে খুদে অক্ষরগুলোর মধ্যে শান্তি নীড়কে পাওয়া গেল না। যাচলে! হয়তো অন্য নামে টেলিফোন আছে অথবা এই বই ছাপা হওয়ার পরে ওরা টেলিফোন নিয়েছে। সবুজ সমিতি পরিচালিত—ইন্দ্রাণী কয়েক পাতা পিছিয়ে সবুজ খুঁজতে গিয়ে উল্লসিত হল। এই তো, সবুজ সমিতি, যোধপুর পার্ক। কলম বের করে নাম্বার লিখে ফেলল সে।

কিন্তু ফোন করে কী বলবে? মনোজের মাকে চাইলে কি ওরা ভদ্রমহিলাকে বুঝতে পেরে ডেকে দেবে? ওখানে উনি নিশ্চয়ই নিজের নামেই পরিচিত।

তবু টেলিফোনের বোতাম টিপল ইন্দ্রাণী। রিং হচ্ছে। তিনবারের বার একটি মহিলা কথা বললেন, ‘নমস্কার, বলুন।’

ইন্দ্রাণী বলল, ‘আমি খুব দুঃখিত এত রাতে ফোন করছি বলে। কিছু মনে করবেন না।’

মহিলা কোনও সাড়া দিলেন না, ফোন ধরে থাকলেন।

‘আসলে আমার এক আত্মীয় বৃদ্ধাশ্রমের খবর নিতে বলেছেন। আপনাদের এই আশ্রমটির কথাই বলেছেন উনি।’ ইন্দ্রাণী কথা বানাচ্ছিলেন।

‘আপনি যদি জানতে চান এখানে কোনও সিট খালি আছে কি না তা হলে জানাচ্ছি, না, নেই। আমাদের এখানে বাইশ জনের অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে। নতুন কোনও অ্যাপ্লিকেশন নেওয়ার প্রস্তুতি ওঠে না।’

‘আপনাদের ওখানে চার্জ কত?’

‘সাড়ে চার হাজার প্লাস ডিপোজিট। কিন্তু এটা জেনে তো কোনও লাভ হবে না।’

‘না, তা নয়। আসলে আমার আত্মীয় সুইডেনে থাকেন। ওখানে এক বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে আপনাদের কথা শুনেছেন যাঁর মা শান্তি নীড়ে থাকেন।’

‘এখানে থাকেন? কী নাম?’

‘ভদ্রমহিলার নাম আমি জানি না।’

‘সুইডেনে থাকে একজনেরই ছেলে। লাবণ্যদির ছেলে।’

‘ওঁর ছেলের নাম কি মনোজ?’

‘মনোজ? না তো! আমার ঠিক মনে পড়ছে না। হতে পারে। আঁম যেন অজয় বলে শুনেছিলাম।’ ভদ্রমহিলা যেন ধন্দে পড়েছেন।

‘কিছু মনে করবেন না, যদিও রাত হয়েছে, তবু ভদ্রমহিলার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারি? মানে আমার আত্মীয় সুইডেন থেকে ফোন করেছেন শুনলে ওঁর হয়তো ভাল লাগবে।’

ইন্দ্রাণী নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কী চমৎকার বানিয়ে বানিয়ে সে কথা বলতে পারছে।

‘ধরুন, দেখছি।’ মহিলা রিসিভার টেবিলে রাখলেন, শব্দটা শোনা গেল।

ইন্দ্রাণী এবার একটু নার্ভাস হল। মিথ্যে কথা বলতে যারা অভ্যস্ত তাদের শেষ পর্যন্ত বলে যেতে কোনও অসুবিধে হয় না। মোটা-রোগা গল্পের বইগুলোর দিকে তাকালেই তার মনে হয় লেখকরা কী চমৎকার বানিয়ে বানিয়ে লিখে যেতে পারেন। আচ্ছা, লেখকরা কি চমৎকার মিথ্যে অনর্গল বলতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ পারতেন?

‘হ্যালো, কে বলছেন?’ বয়স্ক মহিলার গলা ভেসে এল।

‘নমস্কার।’ ইন্দ্রাণী বলল, ‘আপনাকে একটু বিরক্ত করছি।’

‘কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই কার সঙ্গে কথা বলছি।’

দমে গেল ইন্দ্রাণী। সেই প্রৌঢ়া, যিনি মনোজের মা, তাঁর কথা বলার ধরন তো এমন নয়! অবশ্য টেলিফোনে মানুষের গলা বদলেও যেতে পারে।

‘আমি ইন্দ্রাণী।’

‘কোন ইন্দ্রাণী?’

এবার মনে হল কথা বলার ধরনটা পরিচিত। ইন্দ্রাণী বলল, ‘আজ দুপুরে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বৃষ্টির জন্যে আপনাকে লিফ্ট দিয়েছিলাম।’

‘অদ্ভুত। আমি আজ সারাদিন বাড়ি থেকে বের হইনি, আর তুমি বলছ আমাকে লিফ্ট দিয়েছ? তুমি ঠিক কাকে চাইছ বলো তো?’

‘আপনি মনোজের মা নন?’

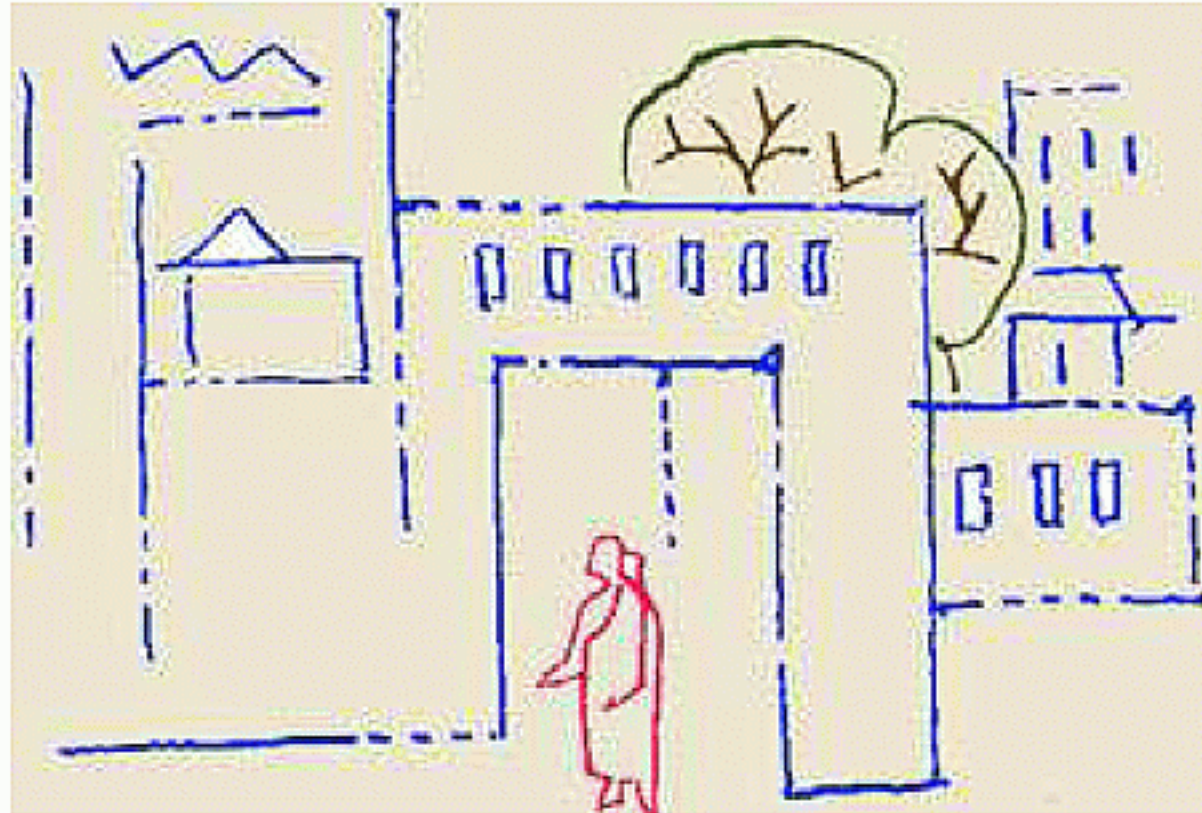
‘অবশ্যই। মনোজ আমার ছেলের নাম।’

‘আপনার ছেলে সুইডেনে থাকেন?’

‘ঠিক। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি। তুমি কী করে?’

‘আমি হাউসওয়াইফ।’ ফাঁপড়ে পড়ল ইন্দ্রাণী, ‘আপনাদের বৃদ্ধাশ্রমে আর কোনও মহিলার ছেলে কি সুইডেনে থাকেন?’

‘নো। কেউ থাকে না। থাকলে আমি জানতে পারতাম। আমার মনে হচ্ছে তুমি অন্য কোনও মতলবে মিথ্যে কথা বলছ। এত রাতে এ রকম রসিকতা করার কারণ কী বলো তো?’



‘আমি খুব দুঃখিত। আচ্ছা।’ রিসিভার নামিয়ে রাখতে পেরে যেন বেঁচে গেল ইন্দ্রাণী। তারপর দু’ হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ল। ছি ছি। ভদ্রমহিলা ভাবলেন সে মতলব নিয়ে মিথ্যে কথা বলছে? পরমেশ শুনলে হাসবে। বেশ হয়েছে, যেটা সামলাতে পারো না সেটা করতে যাও কেন? ঠিক ঠিক। কিন্তু প্রৌঢ়া তো স্পষ্ট বলে গেলেন ওঁর ছেলে সুইডেনে থাকেন, তাঁর স্ত্রী মেমসাহেব, নাতনিও সেই রকম। কলকাতায় এলে ওঁদের গরম লাগে, খারাপ গন্ধ পায়, বলে আসতে চায় না। যাওয়ার সময় পরিষ্কার বললেন, তাঁর ছেলের নাম মনোজ। না, কোনও মতেই সে ভুল শুনতে পারে না। তার মানে

ওই প্রৌঢ়া যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বৃদ্ধাশ্রমে থাকা আর একজন মহিলার গল্প তাকে শুনিয়ে গেছেন।

কিন্তু কেন? কেন তিনি দিনের পর দিন তাকে অনুসরণ করেছেন? নিজের বাসস্থান দেখাতে প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। বৃষ্টির জন্যে চাপে পড়ে যখন বাধ্য হলেন তখন আর একজনকে মডেল করে মিথ্যে বলে গেলেন। খুব রাগ হচ্ছিল ইন্দ্রাণীর। ইচ্ছে করছিল ওই বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে প্রতিটি আবাসিককে দেখে প্রৌঢ়াকে শনাক্ত করে তার জবাবদিহি চাইতে। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে যদি দ্যাখে ওই রকম কোনও প্রৌঢ়া ওখানে থাকেন না, তা হলে তো আর এক সমস্যা। পর পর তিন দিন রাস্তায় বের হলেই ইন্দ্রাণী চারপাশে কড়া নজর রাখল। প্রৌঢ়া নিশ্চয়ই তাকে অনুসরণ করবেন। মেয়ের স্কুলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে অযথা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কিন্তু প্রৌঢ়া দেখা দিচ্ছেন না। হয় মেঘনাদের মতো কোনও আড়ালে আছেন, নয় আসেননি। খুব হতাশ হচ্ছিল ইন্দ্রাণী।

পরমেশ দিল্লি থেকে ফিরে এসে চমকে উঠল, ‘এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?’

ইন্দ্রাণী হাসল, ‘কেন? খারাপ দেখতে হয়ে গেছি?’

‘চোখের তলায় কালি, মুখ শুকনো। প্রায়ই তো বাইরে যাই, কখনও ফিরে এসে এ রকম দেখিনি। কী ব্যাপার, প্রেমে পড়েছ নাকি?’ হাসল পরমেশ।

রাগ হয়ে গেল ইন্দ্রাণীর। কিছু না বলে সরে গেল। ছেলেরা প্রেম ছাড়া অন্য সমস্যার কথা ভাবতে পারে না কেন? যে কোনও বয়সের ছেলে যেমন দুমদাম প্রেমে পড়ে যায় বা পড়ে যেতে চায়, মেয়েরা সেটা পারে না। একটা বয়সে পৌঁছলে মেয়েরা শেকড় গাড়তেই পছন্দ করে।

কিন্তু পরমেশকে ব্যাপারটা না বলেও সে পারল না। সবটা শুনে পরমেশ বেশ সিরিয়াস হল, ‘অদ্ভুত। মিস্টারিয়াস মহিলা বলে মনে হচ্ছে। তুমি দেখলে উনি ওই বৃদ্ধাশ্রমে ঢুকে গেলেন? দরজা খোলা ছিল?’

‘না। দরজা বন্ধ ছিল। সেদিকেই হাঁটছিলেন উনি।’

‘বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়া মানে ভেতরে যাওয়া নয়। তুমি একটু অপেক্ষা করে দেখলে না কেন?’

‘আমি কী করে ভাবব উনি মিথ্যে কথা বলছেন।’

পরমেশ মাথা নাড়ল, ‘তবে একটা কথা ঠিক, ওঁর ওই বৃদ্ধাশ্রমে যাতায়াত আছে। নইলে ওখানকার একজন মহিলার ছেলে সুইডেনে থাকে, তার মেমসাহেব বউ মেয়ে আছে, ছেলোটর না ম মনোজ, এ সব তথ্য জানতে পারতেন না। যাক গে, ভদ্রমহিলা এখন পর্যন্ত তো তোমার কোনও ক্ষতি করেননি, ওঁর কথা ভুলে যাও।’

পরিচিত লোককে বেশি দিন না দেখলে সব সময় তার কথা মনে পড়ে না যখন, তখন এই প্রৌঢ়াকে ভুলতেও ইন্দ্রাণীর দেরি হয়নি। প্রায় মাসখানেক বাদে পরমেশের মামার বাড়িতে দুপুরের নেমন্ত্নে গিয়েছিল ওরা। উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ি। খেয়ে গল্প করে বিকেল ঘনাল। রিন্টি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সারা দিন হইচই করে। ফেরার সময় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে আসার সময় পরমেশ হালকা গলায় বলল, ‘ডান দিকে কী জানো?’

‘কী?’

‘কলকাতার বিগেস্ট রেড লাইট এরিয়া, সোনাগাছি।’

‘যাঃ।’ বলেই উৎসুক হয়ে ডান দিকে তাকাল ইন্দ্রাণী। এবং তখনই সে চিৎকার করে উঠল, ‘গাড়ি থামাও, গাড়ি থামাও।’

ড্রাইভার ব্রেক কষল, গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলে পরমেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী হল? কী দেখলে তুমি?’

‘ওই যে, ওই যে, ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন মহিলা।’ উত্তেজিত ইন্দ্রাণী।

‘কোন মহিলা? এখানকার কোনও মহিলাকে তুমি চিনতেই পারো না।’ ইন্দ্রাণীর প্রসারিত আঙুল লক্ষ করে একজন প্রৌঢ়াকে এক

বালক দেখতে পেল পরমেশ।

‘আমি ঠিকই দেখেছি। সেই মহিলা যিনি নিজেকে মনোজের মা বলেছেন।’

‘ওঃ।’ পরমেশ চোখ বন্ধ করল। ‘ভুল দেখেছ।’

‘আমার ভুল হয়নি।’ জোর গলায় বলল ইন্দ্রাণী।

‘তা হলে তো ল্যাঠা চুকে গেল। যে মহিলা এখানে থাকেন তার চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমার আর কৌতূহল থাকার কথা নয়।’ পরমেশ বলল।

‘আমি ভাবতেই পারছি না। আচ্ছা, আমরা ওই গলিতে যেতে পারি না?’ ইন্দ্রাণী তখনও যেন মানতে পারছে না, উৎসাহ কমছে না।

‘অন্তত মেয়েকে নিয়ে পারি না।’

‘বাবু, কোনও দরকার আছে?’ হঠাৎ একজন গাড়ির জানলার পাশে চলে এল।

‘না না, কোনও দরকার নেই। ড্রাইভার—!’ পরমেশ সতর্ক হল।

‘আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন?’ লোকটা বেশ গায়ে পড়া।

হঠাৎ ইন্দ্রাণী ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘আচ্ছা, এই এখনই একজন বয়স্ক মহিলা ওই বাড়িতে ঢুকে গেছেন, উনি কি এখানে থাকেন?’

‘কে বলুন তো?’ লোকটি গলির দিকে তাকাল।

পরমেশ বলল, ‘ছেড়ে দিন ভাই, কোনও দরকার নেই।’

লোকটি বলল, ‘দু’ মিনিট দাঁড়ান, আমি খবর নিয়ে আসছি।’ বলেই দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গলির ভেতর ঢুকে গেল।

পরমেশ বিরক্ত হয়ে বলল, ‘তুমি না-জেনে বিপদ ডাকছ। এখানে আগ বাড়িয়ে যারা উপকার করতে আসে তাদের মতলব হল ফাঁসিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করা।’

‘তুমি জানলে কী করে? তুমি কি এখানে এসেছ?’

কাঁধ নাচাল পরমেশ। এই সময় লোকটিকে দেখা গেল রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে আসতে। কাছে এসে এক গাল হেসে বলল, ‘আপনারা ভাল-দিদিকে দেখেছেন।’

‘ভাল-দিদি?’ ইন্দ্রাণী বুঝতে পারল না।

‘এখন তো এখানে মেয়েদের সমিতি হয়েছে। সমিতি মেয়েদের অনেক কিছু শেখায়। বড় বড় ঘরের মহিলারাও ওই সমিতিতে সাহায্য করতে আসেন। ভাল-দিদি ওদের গান শেখাতে আসেন সপ্তাহে তিন দিন। দু’ ঘণ্টা পরে বের হবেন। কিছু বলব ওঁকে?’ লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

পরমেশ বলল, ‘না ভাই। আমরা ভুল মানুষকে দেখেছি। তোমাকে কত দিতে হবে?’

জিভ বের করল লোকটি, ‘ছি ছি। আপনি ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার কাছে পয়সা নেব কেন? তা ছাড়া ভাল-দিদির খবর দিয়ে পয়সা নিয়েছি জানলে সমিতি আমাকে ছেড়ে দেবে না।’ লোকটি টুক করে সরে গেল।

ড্রাইভার গাড়ি চালু করল। পরমেশ বলল, ‘তা হলে প্রমাণ হল তুমি ম ভুল দেখেছ!’

‘না, দেখিনি।’ মাথা নাড়াল ইন্দ্রাণী। ‘কিন্তু প্রমাণ হল রেড লাইট এলাকায় যে সব মহিলা যান তাঁদের সবার চরিত্র এক রকম নয়।’

ওরা আর কেউ কথা বলল না। ইন্দ্রাণী ভাবছিল, ভেবে কূল পাচ্ছিল না। এই মহিলা যদি তাকে মিথ্যে বলে থাকেন, নিশ্চয়ই বলেছেন, তা হলে তিনি মহিলা সমিতির ব্যবস্থাপনায় অন্ধকারে ডুবে থাকা মেয়েদের গান শিখিয়ে আলোর স্বপ্ন দেখাতে চাইছেন কেন? বেল বাজাতেই কাজের মেয়ে দরজা খুলল। রিন্টির খুব ঘুম পেয়ে গেছে। এখন শোয়ালে রাত্রে খাওয়ানো যাবে না। তাকে জাগাতে যখন ইন্দ্রাণী ব্যস্ত তখন অভ্যস্ত গলায় পরমেশ কাজের মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কোনও ফোন এসেছিল?’

‘না।’ বলেই মাথা নাড়ল মেয়েটি, ‘হ্যাঁ।’

‘ওঃ, তোমাকে রোজ বলি, ফোন এলে নাম লিখে রাখবে। লিখেছ?’

‘হ্যাঁ।’ ছুটে গিয়ে কাগজটা নিয়ে এল মেয়েটি।

বাঁকাচোরা অন্ধরে লেখা নামটা পড়ে কপালে ভাঁজ ফেলে পরমেশ জিজ্ঞাসা করল, ‘কিছু বলেছে?’

‘না। নেই শুনে রেখে দিল।’ মেয়েটি জবাব দিল।

ইন্দ্রাণী দূর থেকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কে করেছিল গো?’

পরমেশ অন্যমনস্ক গলায় জবাব দিল, ‘মনোজ।’

ছায়া অনুগামী

বাণী বসু



কালীঘাট স্টেশনে নেমে সিঁড়ি ভাঙছিল ইন্দ্রাণী। পাতাল রেল হয়ে তার, তাদের যা সুবিধে হয়ে গেছে ধারণাই করা যায় না। দমদম থেকে কালীঘাট সময় মোটে আধ ঘণ্টা! চিন্তা করা যায়? এই সময়টায় মনে হয় পৃথিবীর সভ্যতম দেশে আছে বুদ্ধিবা। সভ্যতম দেশ কী রকম চোখের দেখা তো দেখেনি। খানিকটা শোনা আর খানিকটা ছবিতে দেখা, স্থির ছবি আর চলচ্চিত্র। এই তো! পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন লম্বা চওড়া স্মার্ট লাগে। পাশে ছোট্ট মিষ্টিকে মনে হয় সমস্যাহীন একটা কেরিয়ারের দিকে মসৃণভাবে এগিয়ে যেতে থাকা একটা বাচ্চা। কত যত্নে, আদরে, মমতায়, কত রকম আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি হবে। বাস্তবে যে ছবিটা এ রকম নয়, তা পাতাল থেকে মাটির ওপর উঠেই মালুম হয়। কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে দিগ্বিদিকে ছুটছে গাড়ি, বাস, অটো, মানুষে মানুষে ছয়লাপ। তাদের চলাফেরার মধ্যে কোনও ছন্দ নেই। এগিয়ে যেতে গিয়ে বারে বারে ধাক্কা খেতে হয়। আর সবই, সবাই-ই যেন কেমন অগোছালো এলানো। ওরই ভেতরে মেয়েরা, বিশেষত অল্পবয়সি মেয়েরা খুব টরটরে। গটগট করে চলে, খটখট করে কথা বলে, স্মার্ট। জিন্স-টপ পরা খাটো-চুল মেয়েগুলোকে

দেখতে ইন্দ্রাণীর বেশ লাগে। কোনও সাজগোজ নেই। চুলের গোছা হেলায় পিঠের ওপর পড়ে আছে, যেন কাউকে বা কিছুকে কেয়ার করে না। ঔদ্ধত্য নয়, স্বাচ্ছন্দ্য। ইন্দ্রাণীর ভাবতে ভাল লাগে তার ি মষ্টি এই রকম হয়ে উঠেছে। তার পরের ধাপেই হবে স্বাবলম্বী। কত রকম লাইন হয়েছে আজকাল— কমপিউটার, ইনটিরিয়র ডেকোরেশন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন-ডিজাইনিং... এমনকী মডেলিং! পরমেশের নানা রকম গোঁড়ামি আছে। ইন্দ্রাণী মুখে বলে না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে এই একঘেয়ে জীবনযাপনে খুব ক্লান্ত। তার মেয়েকে সে এই ছাঁচে ফেলবে না। স্কুলে পড়ল, কলেজে পড়ল, ইউনিভার্সিটিতে গেল, তারপর কতকগুলো ছাপা সার্টিফিকেট সম্বল করে বিবাহ-সমুদ্রে ঝাঁপ। আশ্চর্য! তার কিছু কিছু বন্ধু তখন চাকরি খুঁজছিল, যারা খুব ভাল ছাত্রী, লেকচারার হবার আশায় কলেজ সার্ভিস কমিশনে দৌড়াদৌড়ি করছিল, রবিনা কোনও শো-রুমের রি সেপশনিস্ট হল। সুমিত্রা একটা পাবলিশিং কোম্পানিতে, সুপর্ণা তো রাইটার্সে— ব্যাস, এই পর্যন্ত। তাকে বন্ধুরা বলেছিল, বিশেষ করে অতনু, সলিল, অল্লান— কী করে একটা ছেলের ঘাড়ে চাপবার জন্যে ওয়েট করে বসে থাকিস রে, তোদের লজ্জাও করে না?

ইন্দ্রাণী অবশ্য মুখে মুখে উত্তর দিত— বুঝিস না? তোদের ভাত মার তে চাই না। পিটি, স্রেফ আউট অব পিটি চান্সগুলো তোদের দান করে দিচ্ছি। তোরাও তো কাউকে না কাউকে ঘাড়ে নেবার জন্যে ঘাড় পেতে আছিস।

বললেও, মনে মনে সে জানত সে কোনও বন্ধুর, দুরূহ পথে যেতে চায় না। সে চায় নিরাপদ, ভাবনা চিন্তাহীন, অবসর-সমৃদ্ধ জীবন। তা মোটামুটি সেই রকম জীবনই পেয়েছে সে, বাবা-মা জোগাড় করে দিয়েছেন।



সে তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ করেছে। বিয়ের পরে তারা উত্তরপাড়ার যে ভাড়া বাড়িতে থাকত, সেখানে শ্বশুরমশাই আর ছোট দেওর ছাড়া আর কেউ ছিল না। পরমেশের দুই দিদি থাকেন মুম্বই আর বাঙ্গালোরে। বাড়িতে সে-ই একমাত্র মেয়ে, গৃহিণী, সর্বেসর্বা। খুব স্বাধীনভাবে সংসার করেছে তখন। মহিলাহীন গেরস্থালিতে একটি পুত্রবধূ আসায় সব দিক দিয়েই খুব সুবিধে হয়েছিল সংসারের। তার

পর স্বশুরমশাই মারা গেলেন, দেওর চাকরি নিয়ে চলে গেল ত্রিচি। আর তার পরেই দমদমের ফ্ল্যাটটা কিনল পরমেশ। একটা সংসারের একচ্ছত্র সশ্রান্তী হবার একটা তৃপ্তি বা গর্বও যেমন ছিল, তেমন ছিল চূড়ান্ত বন্ধনের বিরক্তিও। বছর সত্তর বয়সও বোধহয় হয়নি তখন স্বশুরমশায়ের, কিন্তু কেমন বুড়োটে ছিলেন, আরামচেয়ারে বসে বসে ঝিমোবেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁকে ওষুধ, জল, বেলপোড়া, করলার রস, ইসবগুলোর ভূষি সাপ্লাই করো। হাই-প্রেসার, ব্লাড সুগার দুটোই ছিল। অসুখ আর ওষুধ ছাড়া কথা ছিল না মুখে। ইন্দ্রাণীকে একেবারে ছাড়তে চাইতেন না। তার দেওর পুলকেশের আবার খালি কেরিয়ারের চিন্তা, বউদি, জয়েন্টটা তিনবারের চেষ্ঠাতেও পেলাম না, কলকাতা ইউনিভার্সিটির এই এম বি এ সত্যি কোনও কাজে লাগবে কি না কে জানে! দিনের বেলায় একটা ছোটখাটো চাকরি করত, রাত্তিরে পড়া। তার আসতে বেশ রাত। পরমেশেরও তাই। তার খুব হাঁফ ধরত সে সময়ে, মনে হত ইস্‌স্‌ কী ভুলই করেছি। একটা চাকরি যদি থাকত! যত দিন না মিষ্টি এসেছে ইন্দ্রাণীর জীবনটা হয়ে গিয়েছিল তেতো, একেবারে হাকুট তেতো। মেয়েটা এসে তাকে বাঁচিয়েছে। মেয়ের স্কুলের সুবাদে সে যে সপ্তাহের পাঁচ দিন বেরিয়ে আসতে পারছে, আকাশ দেখছে, বাইরের বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে, হোক তাতে পোড়া ডিজেলের গন্ধ, এতগুলো মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছে, এই বা কম কী! শুধু যদি পূর্ণ দাস রোডের হিমালী একটু নরম-সরম ভদ্র-স্বাভাবিক হত! এই সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় সে যে কোথায় কাটায়!

আজকে ভেবেছে গাড়িহাটে উইনডো শপিং করবে। ছোটখাটো কয়েকটা জিনিসও আছে কেনার। কাপড় টাঙাবার নাইলন দড়ি, বেশ সুন্দর জালিওয়ালা ফানেল দেখেছিল সেদিন। গোটা দুই কিনলে হয়। একটা কেরোসিন ছাঁকার আর একটা জল ছাঁকার। কাপড় টাঙাবার ক্লিপগুলোও অর্ধেক গেছে ভেঙে। মিষ্টি স্কুলের গেট পেরিয়ে গেলে সে পেছন ফেরে, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোয়। হঠাৎ কোথায় কে যেন সুতীর স্বরে টেঁচিয়ে ডাকল— ইন্দ্রাণী, এই ইন্দ্রাণী। পুরুষ গলা। এ আবার কী! মেয়েদের কেউ পাবলিক প্লেসে এ রকম নাম ধরে ডাকে? বিরক্ত মুখে পেছন ফিরল সে। লহরের পর লহর অভিভাবকদের মুখ, বেশির ভাগই মেয়ে, অর্থাৎ মা। কচিৎ একটা দুটো কাজের লোক, দারোয়ান কি ড্রাইভার জাতীয়। কে তবে ডাকল

তাকে? বেশ কিছুক্ষণ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। না, নড়বে না।
যে তাকে ডেকেছে, সে-ই খুঁজে নিক। তাকে সে সুযোগটা দেবে।
তারপর কাছাকাছি এলে দেবে আচ্ছা করে কড়কানি! যদি মেসো
মশাই কি সন্দীপদা হন! সে ক্ষেত্রে অবশ্য অতটা বিরক্তি প্রকাশ করা
চলবে না। কিন্তু অনুযোগ তো চলবে! অনুযোগের সঙ্গে মিশে থাকবে
ভর্ৎসনা! আসলে মেসোমশায়ের কথা মনে হল, উনি হংকং ব্যাঙ্কে
এদিককার শাখায় কাজ করেন বলেন; আর সন্দীপদা আছে একটা
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে, ওই দিকে রাসবিহারীতে। যদি
কোনও কারণে বেরিয়ে এদিকে এসে থাকে, আসতেই পারে, তাকে
দেখতে পেয়েছে হয়তো! দেখতেই পারে!

— উঃ, সরুন না একটু। তখন থেকে এক জায়গায় রাস্তা ব্লক করে
দাঁড়িয়ে আছেন!

ঘর্মাক্ত, রক্ত মুখে এক মহিলা বললেন।

সরতে গিয়ে একটা গাড়ির বনেটে ধাক্কা খেল সে। ভাগ্যিস তখনও
সেভাবে স্পিড নেয়নি গাড়িটা! ঘ্যাঁচ করে থামল। শীতল মৃত্যুর
ছোঁয়া যেন কোমরের কাছটাতে। সানগ্লাস পরা গভীর চেহারার ভ
দ্রলোক মুখ বাড়িয়ে বললেন— লেগেছে নাকি? দেখে শুনে পথ
চলবেন। ভুরুতে ভাঁজ।

হঠাৎ কেমন কান্না পেয়ে গেল তার। পরমেশ, পরমেশ, সুপর্ণা,
সন্দীপদা— আমি আর একটু হলে মরে যাচ্ছিলাম! অ্যাক্সিডেন্টে।
মরে যাচ্ছিলাম। ফুটপাথের নিরাপদ কোণে, যদিও নির্জন বলে কিছু
এখন নেই। সে রুমাল বার করে চোখ মুছল, দুজন মাতৃ জাতীয়া
কৌতূহলে তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন। সুদু কৌতূহল। প্রশ্ন না।
সহানুভূতি না। শুকনো কৌতূহল। চোখ ছাপিয়ে আরও জল। — মা
মা, সমস্ত পৃথিবীতে এই মুহূর্তে এত ভিড়ে আমার কেউ নেই মা।
আমি যে কোনও সময়ে একা একা একটা ডেডবডি হয়ে যেতে পারি,
কেউ জানবে না, দেখবে না। আমি এই কলকাতার মুখহীন উপচো-
উপচি ভিড়ে আর একটা মুণ্ডুহীন, পরিচয়হীন, কবন্ধ শুধু। কেউ নেই
যে আমার প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট, সামান্যতম সদয়!

কেন হঠাৎ এ রকম আদিগন্ত অভিমান— কার প্রতি— ইন্দ্রাণী জানে

না। কেন এ চোখের জল? মৃত্যু-ভয়ে? মৃত্যু-ভয় এমনই একা করে দেয় মানুষকে!

সে চোখ মুছে সন্দীপদার সেই প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের দিকে আঙুলে আঙুলে হাঁটতে লাগল। এখন চারদিকের দোকানপাট, পশরা, দোকানি সব কেমন বিশ্রী লাগছে। একটা অনির্বচনীয় বিতৃষ্ণা। যেন সে এ সব জিনিসের প্রয়োজন পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছে।

— বউদি, ভাল নাইটি আছে...

— শাড়ি ফল্‌স্‌ নেবেন? শাড়ি ফল্‌স্‌?

— বলুন দিদি, ধনিয়াখালি, বেগমপুর, ফুলিয়া, শান্তিপুর— সব রকমের তাঁত... ছাপা চাই তো ছাপা...

মোড় পার হয়ে যায়, রাসবিহারীতে পড়েছে এখন। হকার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। কিন্তু আগে ছিল থিতু হকার, স্থাবর, এখন এরা অস্থায়ী, কখনও কখনও জঙ্গম। ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হাঁকছে। বউদি, দিদি, ছোড়দি... পৃথিবীময় কত জটিল সব ব্যক্তিগত সমস্যা, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক রাজনৈতিক... ওদের সমস্যা একদম সরল পাটিগণিত। পেটে খেতে হবে, সওদা যেমন করে হোক বিক্রি করতে হবে। পুলিশের গুঁতো খেয়ে হোক, অর্ধেক লাভ পকেটে গুঁজে দিয়ে হোক, যেভাবে হোক...

ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে পড়ল— ছ' কাটের পেটিকোট আছে? চল্লিশ!

— এদিকে আসুন দিদি। কী রং? কালার না সাদা?

— আমার খদের তুই কেন ভাঙাচ্ছিস! মারব শালা এক থাপ্পড়...

— কী হচ্ছে? খুব গভীর গলায় ইন্দ্রাণী বলল, কেমন একটা দিদি-দিদি ভাব।

— স্যরি দিদি। কিছু মনে করবেন না, এমন খাড়া এই রবিটা... বলেই জিভ কাটল... ছ' কাটের? নিশ্চয়ই আছে! কী রং বলুন।

— রঙিন নিলে তো এক কাচেই রং জ্বলে যাবে!

— আমার কাছে সে মাল পাবেন না দিদি। একেবারে খালি পপলিন, কালার ফাস্ট।

— না। আপনি একটা সাদাই দিন।

পেটিকোট কিনে কী এক অজ্ঞাত কারণে ইন্দ্রাণীর মনটা শান্ত হল। সে আর একটু বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে, বেশি সপ্রতিভভাবে হাঁটতে লাগল। বাসন্তী দেবী কলেজের সামনে একটা ফুচকাঅলা। একলা একলা ফুচকা খেতে কেমন যেন কেমন-কেমন লাগে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির কালে তারা দশ-বারোজন বন্ধু ফুচকাঅলাকে গোল করে ঘিরে ধরত। ছেলেগুলো কেন যেন ফুচকা পছন্দ করত না। করে না। ফুচকাটা ঠিক যেন পুতুল খেলার মতো মেয়েলি ব্যাপার! পাশ দিয়ে যেতে যেতে মন্তব্য করত— এইসান জিয়ার্ডিয়া হবে না। তখন টের পাবি।

দুটি অল্পবয়সি মারোয়াড়ি বউ খিলখিল করে হাসতে হাসতে ফুচকা খাচ্ছে। ইন্দ্রাণী বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের দলে মিশে গেল।

— থোরা ঔর মিরচি দো, ওরা অর্ডার করছে।

— আমাকে সুখা দাও, ইন্দ্রাণী বলল। জিয়ার্ডিয়ার ভয়টা ওর এতদিন পরেও মনের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

— ঝাল?

— দাও।

ফুচকা গুঁড়োনের মিহি শব্দ শোনা যায়, গুঁড়িয়ে পুরটার মধ্যে ে মশাচ্ছে।

একটি বউ বলল— বেটিকে স্কুল ভেজে আসছেন, না?

— হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন!

— হাম ভি তো... বলে হাসতে লাগল আবার।

অন্য বউটি বলল— কোথায় থাকা হচ্ছে?

— আমার বাড়ি দমদম।

বড় বড় চোখ বউ দুটির।

— ই ৎ না দূর!

— কী করা, বলুন? আপনারা...

— লোক ভিউ রোড। আপনি কি এখন দমদম লউট যাচ্ছেন?

— না, ফুচকা ভরা গলায় সে বলল, এখন কি দমদম ফিরে আবার সাড়ে বারোটায় আসা যায়? এই এরকম ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেব আর কী!

মুখে টুক টুক শব্দ করল একজন, অন্যজন বলল— আমাদের সঙ্গে চলুন না!

— না না, আপনারা কেন কষ্ট করবেন?

— কষ্ট? কষ্ট কিসের বহেনজি! চলিয়ে না আপ। কোই নেই উথার। সির্ফ হাম দোনো। হমারা দো অফিস পে, ঔর দো স্কুল পে, বাস। হাসিতে ফেটে পড়ল।

কী করবে? ইন্দ্রাণী বলল, চলুন।

মনের এমন আনচান অবস্থায় একটু বৈচিত্র্য তো হবে। কলেজে তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে পড়ত, মারোয়াড়িই বোধহয়। পূজা। ওদের তিনজনের মধ্যে দুজনের নাম হয় পূজা। কিংবা পিঙ্কি।

— আপনাদের নাম কী? আমি ইন্দ্রাণী দত্ত।

— পূজা ঔর পিঙ্কি... আগরওয়াল।

চোখ বড় বড় করে বিষম খেয়ে একেবারে ইন্দ্রাণী।

দমদমে ওদের কমপ্লেক্সে একজন থাকে রংটা। রংটা কোন প্রদেশীয় তার জানা নেই। কিন্তু অবিকল এক রকম গৃহসজ্জা ওই রংটা আর

এই আগরওয়ালাদের। ঢাউস ঢাউস সোফা, লিভিং রুমের এক কোণে দেয়ালে লাগানো কাঠের মন্দির। তাতে নানা রকমের ঠাকুরের মূর্তি। মাথার ওপর একটা পেলাই ঝাড়বাতি। দু' দিকে দুটো পাখা।

সোফায় গা-টা ছেড়ে দেবার পরে ইন্দ্রাণী বুঝতে পারল সে কতটা ক্লান্ত ছিল। এখনও তেমন গরম না পড়লেও রোদ খুব কড়া। তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনো, পাতাল থেকে উঠে ভিড়, অটো এবং তার ঝাঁকুনি, অভিভাবক-শ্রোতের মধ্যে দিয়ে স্কুল গেট। তারপর গাড়ির ধাক্কা। কেটে-যাওয়া ঘুড়ির মতো লক্ষ্যহীনভাবে গড়িয়াহাট রাসবিহারীর মোড় পার হওয়া... ঘরটা চমৎকার ঠাণ্ডা। সোফাটা খুবই নরম। ওরা তিন গ্লাস লসি নিয়ে এল।

— পিজিয়ে বহেনজি !

নিজেরাও তুলে নিল দুটো গ্লাস।

এই পরিস্থিতিতে সঙ্কোচের প্রশ্ন থাকে না। লসিতে চুমুক দিতে জুড়িয়ে গেল শরীরটা।

— কীভাবে করেছেন ? খুব ভাল হয়েছে।

— মিক্সি, আইস, পুদিনা... বাস।

— লাঞ্চ করেননি তো !

এবার ইন্দ্রাণী সতর্ক হয়ে গেল। বলল, আমি খুব হেভি ব্রেকফাস্ট করে বেরোই। মেয়েকে নিয়ে একেবারে বাড়ি ফিরে লাঞ্চ খাই।

— ভুখ লাগলে বোলবেন কিন্তু। আমরা তো ফুচকা, তার আগে পাপড়ি-চাট, পাও-ভাজি এ সব বহুৎ খেয়েছি। ভুখ লাগছে না।

— আমারও না।

পাশের টেবিলে সাজানো ফিল্ম ম্যাগাজিন। একটা তুলে নিল ইন্দ্রাণী।

— বহেনজি, বহেনজি, আপনার টাইম হয়ে গেছে। মৃদু নাড়া খেয়ে নড়েচড়ে বসল ইন্দ্রাণী। অবাক কাণ্ড! সে ঘুমিয়ে পড়েছিল! ক্লান্তি না ঠাণ্ডা, ঘরের আরাম না লস্কি? বউ দুটি মৃদু স্বরে কথা বলছিল ফিল্ম পত্রিকা উল্টোতে উল্টোতে। ছবি দেখছিল। মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণীকে ডেকে দেখাচ্ছিলও। ফিল্ম জগতের নানা খবরাখবর। কার কার ডিভোর্স হয়ে গেছে বা হবে। কোন স্টারের সঙ্গে কোন মডেলের নটঘট। কোন প্রোডিউসার আসলে সাটা ডন। আরও অনেক বেআইনি ব্যবসা আছে। এই সব শুনতে শুনতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক শুনে একেবারে উঠে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। পূজা বলল, চলুন। পিঙ্কি থাক। আমি একাই যাব। ও ভি তো সো গিয়া। ইন্দ্রাণী লজ্জা পেয়ে বলল, কী আছে বলুন তো আপনাদের ঘরে? এত ঘুম পেয়ে গেল কেন?

মেয়েটি চোখ নাচিয়ে বলল, জরুর কিছু হিরোইন-মিন হোগা।

পূজা আগরওয়ালকে অনেক থ্যাংক্‌স্ দিয়ে যখন আবার মিষ্টিদের স্কুলের রাস্তায় ঢুকছিল ইন্দ্রাণী, ভাবছিল। মিষ্টির আজকে স্পেলিং টেস্ট আছে, কিন্তু সে কথা না। সে ভাবছিল সে খুব অমিশুক। এই যে বউ দুটি তাকে নিজেদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল, তিন ঘণ্টার নিশ্চিত আশ্রয়, যা তার বন্ধু এবং বন্ধুর মা দিলেও, বন্ধুর ননদ দিতে বিরক্ত হত, তারপর এই লস্কি, ঘুমিয়ে পড়বার স্বাধীনতা, জাগিয়ে দেওয়ার দায়, এ সব সম্বন্ধে সে বউ দুটির দিকে একটুও এগিয়ে যায়নি। ভদ্রতা, শুকনো হয় তো নয়, কিন্তু নিছক ভদ্রতার বেশি কিছু করতে উৎসাহ পায়নি। কেন? সে কি চিরকালই এমন ছিল! নিজের বাইরে কিছু, কাউকে দেখতে পেত না? খুব হিসেবি নাকি সে? দিব্যি ওদের ফ্ল্যাটে সময় কাটাল, আতিথেয়তা নিল, নিজের থেকে নিজের খবর একটাও দিল না, ওদের খবরও একটাও জিজ্ঞেস করল না... নিজেকে এত আত্মকেন্দ্রিক, সুযোগ হাসিল করা ধান্দাবাজ মনে হতে লাগল তার, যে গ্লানিতে মন ভরে যেতে লাগল। কিছুটা আগেই সে অভিমান করে ভাবছিল বটে তার কেউ নেই। কেউ তাকে চেনে না। জানতে চায় না। কারও কোনও দরদ নেই। বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা পারস্পরিক। সে-ও তো কাউকে চিনতে চায়নি। খবরের কাগজ পেতে বসা মায়েদের আড্ডাতে একদিনও তো সে গিয়ে বসেনি! বরং একটা তাক্সিল্যের ভাবই দেখিয়েছে। গাড়ি নিয়ে বেরোলে তো সে

কাউকে গ্রাহ্যই করে না, হিমানীকে গাড়ি-মধ্যস্থ নিজেকে দেখাবে বলে ছটফট করে। অথচ ভাবতে গেলে, হিমানীর মানসিক কিছু সমস্যা থাকতেই পারে। স্কুলে চাকরি করত, ছেড়ে দিয়েছে, কেন? নিশ্চয়ই সেখানে কিছু ঘটেছিল! তারপর এখনও বিয়ে-টিয়ে হয়নি। দেখতেও কালো। সব কালো মেয়েরই যে কমপ্লেক্স থাকবে তার কোনও মানে নেই, আবার থাকলেও কিছু বলার নেই।

মিষ্টি চুল দুলিয়ে ছুটে আসছে। হাতের কাছে যে ট্যাক্সিটা পেল উঠে পড়ল ইন্দ্রাণী। গাড়িয়াহাটে এই একটা সুবিধে। কালীঘাটের মতো অল্প দূরত্বে যেতেও আপত্তি করে না ড্রাইভাররা।

— মা কী দেখছ? আমাদের শিউলি আন্টিকে? ওই তো! ও-ই দিকে। না, কোনও শিউলি আন্টিকে সে খুঁজছিল না। কী জটিল, দুর্বোধ্য এক খোঁজ তার ভেতরে, এর মাথা মুণ্ডু সে বোঝে না। আসলে আগরওয়ালদের বাড়ি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠাণ্ডাতেও নয়, লস্যির আরামেও নয়, কাল রাতে একেবারে ঘুম হয়নি বলে। রে ববার। একেবারে হঠাৎ পরমেশের সেই সুইডেন-প্রবাসী বন্ধু এসে উপস্থিত। পরমেশকে ওর অফিসে জানিয়েছিল অবশ্য। পরমেশই তাকে সারপ্রাইজ দেবে বলে বলেনি। তখন বিকেল, মিষ্টি বেড়াতে গেছে, হঠাৎ বেল বাজল, পরমেশ মুখে একটা কেমন হাসি নিয়ে বলল— দরজাটা খুলে দাও না, আমি সকাল থেকে কাগজটা পড়ে উঠতে পারিনি। ইমরানের কলামটা পড়ছি।

দরজা খুলতে, টাক মাথা, খুব চকচকে চেহারার এক যুবক। পরমেশের বয়সী হবে। খুব সাবলীলভাবে বললেন— আপনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রাণী? আমি পরমেশের বন্ধু মনোজ।

ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে পরমেশ।— কত খুঁজে খুঁজে আপনাদের পাত্তা করতে পেরেছি, যদি জানতেন...

ইন্দ্রাণী তখনও হতবাক, সে নমস্কার করে ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল। পরমেশ তাড়াতাড়ি এসে চাপা গলায় বলল, রাগ করেছে?

— এখন আমি ওকে কী দিই?

— কী আবার দেবে? শ্রেফ চা। উনত্রিশ বছর সুইডেনে। ও আর

কিছু খাবে না। চটপট চলে এসো।

— এখানে তোর আত্মীয়স্বজন এখন কে কে আছেন? কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল পরমেশ।

— নো বডি টু স্পিক অফ। দাদা তো ইংল্যান্ডে সেটল্ড, ডাক্তার। বোন থাকে অদ্ভুত একটা জায়গায়, কসোভো। ওর স্বামী ফরেন সার্ভিসে আছে। আমি এসেছি এক জ্ঞাতিদাদার কাছে। ওঁর মেয়ের বিয়ে। বুঝলি পরমেশ, এই মেয়েটাকে আমিই এক রকম মানুষ করে ছি। দূর থেকে। তা-ই...

— তোর মা বাবা?

— মা? সে তো কলেজে পড়তেই মারা গেছেন। আর বাবা থাকতেন এই দাদার কাছে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও নিয়ে যেতে পারিনি। না দাদা, না আমি। বাবা চলে গেছেন তা-ও বছর খানেক হল।

পরমেশ আর মনোজ অনেকক্ষণ আড্ডা মারল। ইন্দ্রাণী মাঝে মাঝে একটু হাসি আর কথার পিঠে সামান্য কথা ছাড়া আর কিছুই যোগ করতে পারেনি। তাকে ঘিরে যেন একটা স্তব্ধতার বলয় তৈরি হচ্ছিল। সেই বলয়ের মধ্যে ভেসে আসা প্রতিধ্বনির মতো কেউ বলছিল— আমি মনোজের মা, আমি মনোজের মা, আমি মনোজের... রাত্তিরে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারেনি ইন্দ্রাণী। এবং আজ এখন সেই তাঁকেই খুঁজছিল সে নিজের অজান্তে। কৌতূহল নয় শুধু, কেমন একটা ভেতরের টানে।

ছায়া অনুগামী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়।



ইন্দ্রাণী সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় ভাবল, যদি পরমেশ আগে এসে যায় তবে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে। অফিস থেকে ফিরতে পরমেশের প্রায়ই রাত হয়, আবার কাজের চাপ না থাকলে আগোও সে চলে আসে। আগে ফিরে এলেই ধরা পড়ে যাবে— কিন্তু তার যে মাথা ঠিক নেই।

কেউ যে ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে তাকে ডাকে— ইন্দ্রাণী!

সে কে? সে কেন ডাকে? তাকে সে খুঁজে পায় না কেন? উদাস উদভ্রান্ত ইন্দ্রাণী কেন পরমেশের কাছে লুকিয়ে যাচ্ছে সব কিছু— তার তো এমন পরিস্থিতিতে পড়ার কথা না। সেই কাতর আন্তরিক কণ্ঠস্বর— তোমাকে দেখলে...

দেখলে, কী দেখলে, দেখলে কী মনে হয় তাঁর, তাকে দেখলে কোনও স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলা যদি শুরু হয় ভদ্রমহিলার। তার বয়সি কোনও মেয়ের স্মৃতি, যদি থাকে, থাকতেও পারে, অথবা ছিল, কোথাও সে চলে গেছে, কিংবা কোনও অমোঘ মৃত্যু যদি মেয়েটিকে ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

আর তার পরই যে ভদ্রমহিলার হাসিমুখ মুছে গিয়ে এক ক্লান্ত বিষণ্ণতা ভেসে উঠেছিল— কী করুণ এবং আশ্চর্য এক নিঃসঙ্গতা— দেখলে সহ্য করা যায় না। দু' চোখ তাঁর অশ্রুতে সজল হয়ে উঠল— ধরা গলায় সেই উচ্চারণ 'আমি মনোজের মা।' এর পর কী করে তাঁকে অবিশ্বাস করা যায়! মানুষের কণ্ঠস্বরে শুধু তার সামাজিক অবস্থানের কথা থাকে না, তাঁর জীবনের কথাও থাকে। রাতে ফোন করে ইন্দ্রাণী হোঁচট খেয়েছিল ঠিক— সব চিন্তাভাবনা তার গুবলেট করে দিয়েছিল, তিনি বেরই হননি, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কোনও অবকাশই নেই— তুমি বলছ লিফ্ট দিয়েছ, তুমি ঠিক কাকে চাইছ বলো তো— ইন্দ্রাণী

ভাবছে এটা তাঁর ক্যামোফ্লেজ— এখন এই ক্যামোফ্লেজ ভেঙে দেবার চেষ্টায় সে মরিয়া হয়ে উঠছে। কারণ, যদি কেউ মিষ্টির কোনও ক্ষতি করে। আজকাল বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণী বের হয়ে যায়। মিষ্টির অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে, কোথাও তারা বেড়াতে যেতে পারত— পরমেশের ইচ্ছেও ছিল ছুটির কটা দিন তারা মিষ্টিকে নিয়ে কোথাও পাহাড়ের উপত্যকায় অথবা সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ইন্দ্রাণী কোনও উৎসাহ দেখায়নি।



সিড়ির মুখে দরজার বেল বাজাল ইন্দ্রাণী। দেখল, পরমেশ দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

কোথায় গেছিলে! চোখমুখের কী অবস্থা, কোথায় যাও! চাপা অশান্তির বীজ বোনা হয়ে গেছে যেন— পরমেশ বোধহয় আগেই টের পেয়েছে, কাজের মেয়েটা বিশ্বাসী বলেই বউদির মাঝে মাঝে এই বের হয়ে যাওয়া পছন্দ করছে না।

ইন্দ্রাণী পরমেশের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। পরমেশের গভীর চোখমুখ সে সহ্য করতে পারে

না। বাথরুমে ঢুকে সে তার সায়া শাড়ি ব্লাউজ খুলে কতক্ষণ যে শাওয়ার খুলে ডুবেছিল জানে না, পরমেশ কেমন কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে ডাকছে, আরে, বাথরুমে কী করছ?— ইন্দ্রাণী খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, কিছু করছি না, আমার সায়া শাড়ি দিতে বলো। কী গরম!

কোথায় বের হয়েছিলে? পরমেশ না বলে পারল না।

খুঁজতে বের হয়েছিলাম।

সহসা পরমেশ মাথা গরম করে ফেলল, কাকে খুঁজতে বের হয়েছিলে? আমরা কি সবাই হারিয়ে গেছি!

নিজেকে।

পরমেশ চৈতন্যে বলল, চুপ করবে! কী হচ্ছে সব, যাব যেদিকে দু' চোখ যায় বের হয়ে।

এতকাল পর নিজেকে খোঁজার সময় হল। এতদিন কী করছিলে। রাতে ঘুমোও না, জানলা খুলে দাঁড়িয়ে থাকো।

ইন্দ্রাণীর যেন কোনও বিকার নেই। সে আর জবাব দিচ্ছে না। সে ভিজ়ে চুলে বের হয়ে এল। তোয়ালে দিয়ে চুল পৌঁচিয়ে রেখেছে। মা ফিরে এলেই মিষ্টি লাফায়, মায়ের ব্যাগ হাতড়ায়, কী এনেছে মা— কিছু না কিছু মা নিয়ে আসবেই— ছবির বাক্স, এবং ইংরাজি গল্পের বই, এ টেল অফ টু সিটিজ, অলিভার টুইস্ট, হাইডি। বই পেলে সে সহজেই ডুবে যেতে পারে— ছবির বাক্স পেলে, সে সহজেই ছবি আঁকার পৃথিবীতে ঢুকে যায়, পৃথিবী এত সুন্দর, চারপাশে যেন এক সুন্দর বনভূমি বিরাজ করছে, পাখ-পাখালি উড়ছে, গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে, গল্পের ম্যান্ডেলার মতো তার মাথায় পালক গোঁজা থাকে।

পরমেশ বোঝে এই খোঁজার মধ্যেই একদিন মিষ্টি নিজেকেও খুঁজে পাবে। যেমন ইন্দ্রাণী খুঁজে পেয়েছিল, আবার বোধহয় কিছু হারিয়েছে।

আয়নায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী দেখল, সত্যি তার চোখেমুখে মালিন্য লেগে আছে। রূপচর্চায় সে খুবই ওস্তাদ। নিজেকে আড়াল করার জন্য সে আজ বেশি সময় দিতে গিয়ে দেখল, পরমেশ বসার ঘরে বিশেষ অস্থিরতা নিয়ে পায়চারি করছে।

ইন্দ্রাণীর খারাপই লাগছিল। সে সোফায় এসে বসে বলল, কখন ফিরেছ! জামাকাপড় না ছেড়ে আমার ফেরার অপেক্ষায় আছ। ঘামে শরীর চ্যাট চ্যাট করছে— তুমি পারও। সে নিজেই উঠে গিয়ে বলল, যাও, বলে পাজামা-পাঞ্জাবি হাতে ধরিয়ে দিল।

পরমেশ দাঁড়িয়েই থাকল।

আরে কী হল, যাও না। একসঙ্গে দুজনে চা খাব।

কোথায় গেছিলে বলো।

ইন্দ্রাণীর মুখে মজার হাসি ফুটে উঠল। তারপর কেমন কিছুটা বিমর্ষ হয়ে গেল। বলল, বাবু গো ভয় নেই, তোমাদের ফেলে কোথাও যাচ্ছি না। সে সাহস আমার নেই।

আজেবাজে বকবে না। কোথায় গেছিলে?

নন্তু মামার বাড়ি।

নন্তু মামা তো তোমার কবেই ফুটে গেছেন। সেখানে কী দরকার!

মনোজের মার খোঁজে।

তার মানে?

মামিমা যদি ‘মনোজের মা’ বলে কাউকে চেনেন। মেসোর কাছেও গেছি।

কী বললেন?

সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। মামিমা বললেন, বাড়িতে গানবাজনা চর্চা হত শুনেছি, তোমার বাবা থাকলে মনোজের মাকে চিনতে পারত। মেয়েরা তো এক বয়সে কারও না কারও মা হয়ে যায়। তুমিও হবে। একালবর্তী সংসারে মানুষজন একটু বেশি মাত্রাতেই থাকে। মেলা কাজের লোকও থাকে। সেখানে একজন মনোজের মা থাকলেও থাকতে পারে। তুমি ম তাকে এত খুঁজছ কেন!

ইন্দ্রাণী বলল, তাঁকে আমার খুব আপনজন মনে হচ্ছে। তাঁকে খুব দরকার।

পরমেশ বলল, সুইডেনের মনোজ তো তোমার বাড়ি ঘুরেও গেল।

সুইডেনে তোমার বন্ধু মনোজ ছাড়া আর কোনও মনোজ থাকতে পারে না! তিনি তো বলেছেন তাঁর নাম লাভণ্য— ছেলে সুইডেনে থাকে। ফোনে তো অস্বীকার করেননি।

পরমেশ বলল, পারে না বলছি না। ফোন করার পর তো ভদ্রমহিলা বেমালুম অস্বীকার করল।

ইন্দ্রাণী বলল, ওটাই ধন্য, বুঝছ না কেন, তিনি হয় তো সেই বৃদ্ধাশ্রমে নিজেকে ফাঁস করতে চান না। মিষ্টির যদি কেউ কোনও ক্ষতি করে।

পরমেশ বলল, এই অলীক মায়ার কুহকে পড়ে যাওয়া ঠিক না— আরে চিনি দিসনি। জিভ ভোতা করে দিলি। তোমার মিষ্টির কে ক্ষতি করবে! কেন এ সব ভাবছ।

ইন্দ্রাণী বলল, তোমার বাবা বেঁচে থাকলেও তাকে হয়তো চিনতে পারতেন। কী যে করি, কার কাছে যাই— তার কথাবার্তা শুনে, চোখ দেখে এবং চোখের জলে কোথায় যেন এক অবলা নারীর সম্পর্কের টান টের পেয়েছি। রাতে ঘুমোতে পারি না। কেবল যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে কেউ বলছে, আমাকে চিনতে পারলে না! — আমি যে বড় আত্মপর পরমেশ। শরীরে জোয়ার এসে গেলে নারী আত্মরতির অন্ধকারে ডুবে যায়। পুরুষ ছাড়া তার আর কোনও অবলম্বন থাকে না।

একটু থেমে কেমন অন্যমনস্ক গলায় ইন্দ্রাণী বলল, সব যদি ভুলে যাই।

পরমেশ বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। যত্ন সব। থামো। কী ভুলে গেছ ভাবছ! তাঁকে খোঁজার কোনও দরকার নেই। আরে এখন যা দিনকাল, রানিটুনির সংসার, মা বাবাকেই কেউ দেখে না, আর কতকাল পর কে তোমাকে আড়ালে লক্ষ্য করছে, সেই নিয়ে শরীর খারাপ করছ। অনিদ্রায় ভুগছ। তাঁর পরিচয়ে আর কী লাভ তোমার। সেই তো!

ইন্দ্রাণী মাথা ঝুঁকে বসে থাকল।

তবু যা হয়, ইন্দ্রাণী দিন দিন অধৈর্য হয়ে পড়ছে। মিষ্টিকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে সে যে স্পষ্ট শুনেছে— কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। যদি সন্দীপ হয়, কিংবা মেসোমশাই— সে ভেবেছিল যে ডাকছে, সে নিজেই হাজির হবে। কেউ তো হাজির হয়নি। এবং তারপর থেকে, মাঝে মাঝে যে সে তার ডাক শুনতে পায়।

ইন্দ্রাণী আমি এখানে।

ইন্দ্রাণী নিজেই বিড় বিড় করে বকে, তুমি কোথায়?

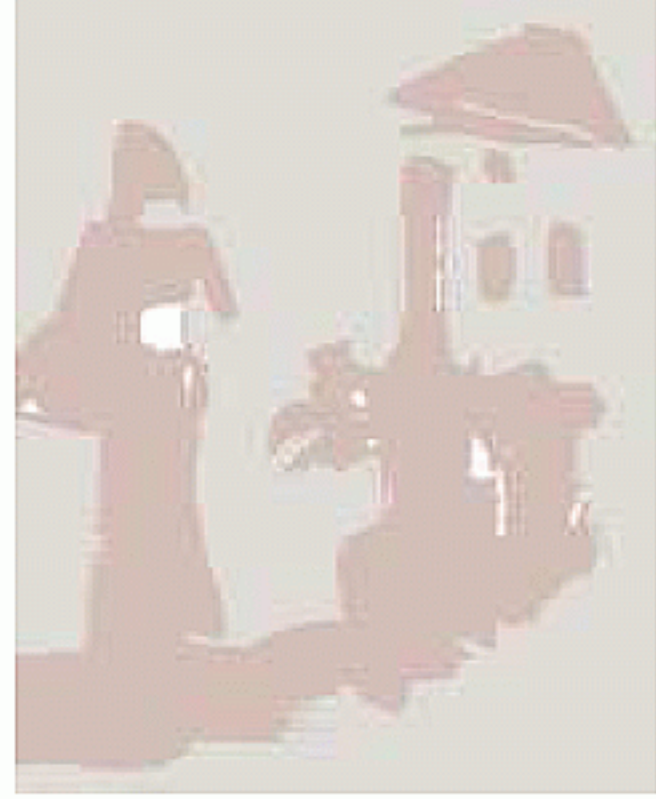
আমি নদীর পাড়ে।

তুমি কোথায়?

আমি গাছের ছায়ায়।

তুমি কোথায়?

বৃষ্টিতে হেঁটে যাচ্ছি।



তুমি কি মনোজ পৃথিবীর সর্বত্রগামী। তুমি কি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ? আর আমিও কি একজন মনোজকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। পরমেশ্বরের কী দোষ।

সে তো কোনও বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেনি। আমার কী ভয় ধরে গেছে, মনোজের মার মতো আমিও মিষ্টির মা হয়ে যাব। মিষ্টিরও তাই। সেও অনুসরণ যোগ্য এক ছায়া, প্রতিবিন্দু ফেলে বড় হচ্ছে— আমরা সবাই। আমি কী করব মনোজ। তোমার বউ এ দেশে এলে গরম ম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, চারপাশে খারাপ গন্ধ। সে যে তোমার মাকে সহ্য করতে পারে না। একটা মাত্র নাতনি— নাতনি তার ঠাকুমাকেই চেনে না। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ঘরবাড়িতে মানুষের আর কী থাকতে পারে!

পরমেশ্বর বাথরুমে ঢোকান সময় বলল, আরে, এভাবে মাথা গোঁজ করে কেউ বসে থাকে। ওঠো, দ্যাখো মিষ্টি কী করছে। মিষ্টিকে বড় করে তুলতে পারলেই তোমার বড় হওয়া সার্থক। এটা বোঝো না!

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে বলল, একটা কথা বলব?

কী কথা?

তোমার গাড়িটা নিয়ে আমি ক’দিন বের হব। গাড়িটা দেবে? আশ্চর্য কাতর অনুনয় ইন্দ্রাণীর।

পরমেশ্বর এক পলক ইন্দ্রাণীকে দেখল। তারপর খুবই গভীর গলায় বলল, না, একা বের হবে না। চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছ। গোপালকে বলব, তোমাদের দিয়ে আসতে নিয়ে আসতে।

আমার কিছু হবে না। তোমার অসুবিধা থাকে দেবে না। বলে তার বেডরুমে ঢুকে গেল।

টুকিটাকি জিনিসপত্র সরিয়ে কী খুঁজছে। পরমেশ্বর বোঝা খেপে গেছে ইন্দ্রাণী— টুকিটাকি সরাতে সরাতে সে এক সময় সাজানো-গোছানো বেডরুমটা লগুভগু করে দেবে।

পরমেশ্বর বলল, ঠিক আছে যাবে। আমি বুঝতেই পারছি না— রহস্যটা মনোজের মা, না তুমি ম! মাঝে মাঝে কেন যে মনে হয় মিষ্টির কোনও অকল্যাণ না হয়। ভদ্রমহিলা তো মিষ্টিকে দেখলেই আদর করেন। যদি কোনও খারাপ মতলব থাকে!

ইন্দ্রাণী চোঁচিয়ে উঠল, আমি সেটাই চাইছি। একটা হেস্টনেস্ট করতে না পারলে পাগল হয়ে যাব।

এই করে একদিন রেডলাইট এরিয়ায় সে ঢুকে গেল। দেখল সেই লোকটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখছে। কাছে এসে বলল, আপনি গাড়ির বউদি না! ভাল দিদিকে খুঁজছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ তো আসার কথা। নারী সমিতির ঘর থেকে ফোনে খবর পেলাম। কিন্তু আসেননি এখনও। চলুন, সমিতির ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রাণী ভিতরে ঢুকে দেখল বেশ ছিমছাম ঘরটি। একজন যুবতী মেয়ে চেয়ারে বসে খাতায় খুব নিমগ্ন হয়ে কী লিখছে। সে যে ঢুকেছে, ঢুকে দেয়ালের ছবিটবি দেখছে— স্বামী বিবেকানন্দর ছবিটাই সব চেয়ে বড়, গান্ধীজির ছবিও আছে, মৃদু ধূপের সৌরভ এই ঘরটাকে বেশ পবিত্রই করে রেখেছে— সহসা খেয়াল হলে মেয়েটির প্রশ্ন, কাকে চান?

ভালদিদি কখন আসবেন?

আসার তো সময় হয়ে গেছে। বসুন।

সতরঞ্জি চাদর পাতা হচ্ছে। দু-একজন করে মেয়েরাও জড় হচ্ছে— আশ্চর্য, ইন্দ্রাণীর এতক্ষণ যে ত্রাস ছিল, তাও যেন নেই, যেন কোনও সঙ্গীত আসরে সে গান শুনতেই এসেছে।

কিন্তু ভালদিদি হাজির হলে বিস্ময়ে ইন্দ্রাণীর চোখ কপালে উঠে গেল। পরনে গেরুয়া বসন, চুল চুড়ো করে বাঁধা, সর্বান্তে রাধামাধবের তিলক। গলায় গন্ধরাজ ফুলের মালা। কোথায় তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার করে বার্ধক্যের কাছাকাছি! ছিপছিপে গড়ন ঠিক, মুখেচোখে দ্বিধাহীন এক স্বর্গীয় সুষমা— কী করে যে বলে, আপনি মনোজের মা না?

চটপট মেয়েরা এসে গড় হচ্ছে। কোথায় আধখানা ঘোমটা মাথায়, চুল সব পাকেনি ঠিক, চশমা পরা চোখ দুটোতে মার্জিত ছাপের চেয়ে আলাদা এক ভগবৎ সৌন্দর্য বিরাজ করছে।

একবার ইন্দ্রাণীকে চোখ তুলেও দেখলেন না। ‘মনোজের মা’ না অন্য কেউ। সে সবার অলক্ষ্যে বের হয়ে হাঁটা দিলে দেখল, সেই লোকটি পানের রসে চুবিয়ে আছে মুখ।

দেখা হল ভালদিদির সঙ্গে?

ইন্দ্রাণী পালাতে পারলে বাঁচে। সেদিন তো সাদা শাড়ি পরনে ছিল এবং মাথায় আধখানা ঘোমটাও ছিল। তা হলে কি তার চোখের ভুল। তাকে এতটা উপেক্ষাই বা করলেন কী করে।

কেন যে মনে হল ইন্দ্রাণীর, এভাবে হবে না। সোজা শাস্তি নীড়েই সে যাবে।

মিষ্টির ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। সে আগের মতোই পাতাল রেল মিষ্টিকে নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। মেয়েকে স্কুলে ঢুকিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় ধরে গড়িয়াহাটের মোড়ে কিংবা ঢাকেশ্বরী দোকানে পাশে, কখনও হাঁটতে হাঁটতে গোলপার্কে গিয়ে দাঁড়ায়। এবং ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়েও চলে যায়— যদি আবার দেখা হয়ে যায়! সে ফিরেও আসে। আর কিছুটা গেলেই গলি, গলির মোড়, কিন্তু শাস্তি নীড়ে ঢুকতে সাহস পায় না। যদি ভদ্রমহিলা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। মাঝে একদিন, স্কুলের গেটে মিষ্টির সঙ্গে দেখা, মিষ্টিকে খুব আদর করে মনোজের মা কোলেও তুলে নিতে চেয়েছেন। তবে সে কোলে ওঠেনি। কারও কোলে উঠতে তার লজ্জা হয়। সে তো বড় হয়ে গেছে।

কী যে মনে হয়, এভাবে এখন গোলকধাঁধায় আর কাঁহাতক ঘোরা যায়! স্কুলে গেটের ভিড়ে

সে থাকলে মনোজের মা আসে না। সে না থাকলেই আসে। পর পর দু-দিন এমন ঘটনায় সে তাজ্জব।

তার কী মনে হল কে জানে, সোজা গাড়ি করে বৃদ্ধাশ্রমে একদিন হাজির। লাভণ্য নাম, সবাই লাভণ্যদি ডাকে এই বৃদ্ধাশ্রমে, তারই পুত্র সুইডেনে থাকে। তার নাম যখন মনোজ অথবা অজয়ও নাম হতে পারে— তখন তাকে দ্বিতীয় মনোজের মা ভেবে সব কিছু খুলে বলা যেতে পারে। ভদ্রমহিলাকে নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে, মিষ্টির কোনও অকল্যাণ যদি হয়, হতেই পারে— দিনকাল ক্রমে যা খারাপের দিকে যাচ্ছে, সে কিছুতেই আর ভরসা পাচ্ছে না। সে মা, লাভণ্য দেবীও মা, নিশ্চয়ই সব শুনে তিনি কী করা উচিত পরামর্শ দিতে পারেন— আর যদি উনি অজয়ের মা হন, তবে তো বুঝতেই হবে ভদ্রমহিলা তাকে নিয়ে খেলাচ্ছেন— পেছনে কোনও যে চক্র কাজ করছে না কে বলবে।

ভিতরে ঢুকে কিছুটা সে অস্থির হয়ে পড়ল— কাচে মোড়া রিসেপশনের ঘরটি— সে সেখানে ঢুকেই জল তেঁপায় কাতর হয়ে পড়ল।

ইন্দ্রাণী বলল, এক গ্লাস জল।
বসুন দিচ্ছি।

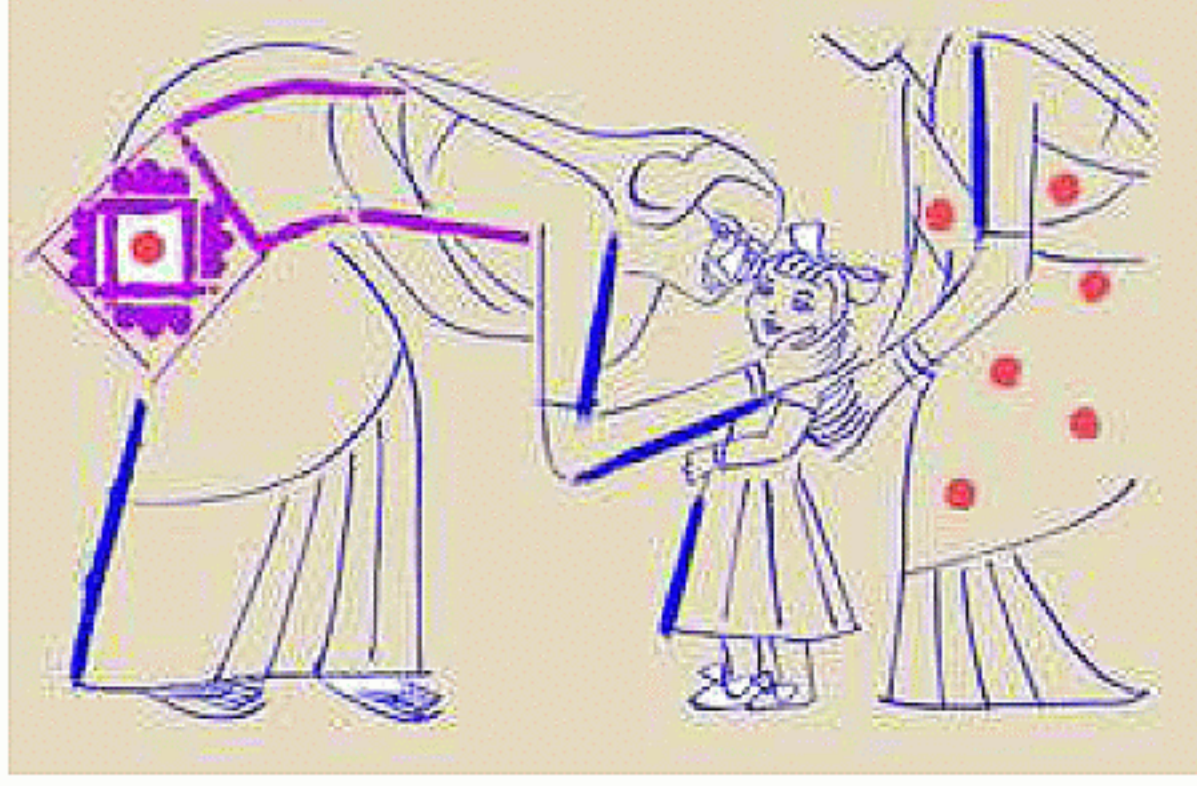
জল খেয়ে ইন্দ্রাণী যেন কিছুটা তাজা বোধ করল। আঁচলে মুখ মুছে বলল, আমি লাভণ্যদির সঙ্গে দেখা করতে চাই। খুব দরকার।
লাভণ্য নামে তো কেউ এখানে থাকে না। আপনি ভুল করছেন।
তার ছেলে সুইডেনে থাকে।
অ, মনোজের মার কথা বলছেন। তার ছেলের নাম মনোজ— সিঁড়ি ধরে উপরে চলে যান, ডান দিকের চার নম্বর ঘরে তাকে পাবেন। এই অসময়ে আমরা কাউকে ভিতরে ঢুকতে অ্যালাউ করি না, কিন্তু আপনার মুখ-চোখের অবস্থা ভাল না।

ইন্দ্রাণীর প্রায় ধড়াস্ করে মাটিতে পড়ে যাবার অবস্থা। আরে, এটা কী খেলা! জীবনে এমন একটা দুষ্ট পাপ চক্র ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করবে স্বপ্নেও ভাবেনি। মনোজ নামে কোনও কিশোরের সঙ্গে তার যে প্রেম থাকতে পারে সেটাই তো সে মনে করতে পারে না। স্কুল জীবনের সহপাঠীরা কেউ মনোজ নয়তো! দুজনে হাঁটতে হাঁটতে যদি কখনও গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়, বন্ধুরা গাছের নীচে কিংবা মোড়ে অথবা কোনও চায়ের দোকানে ফেরার সময়। পড়াশোনার সঙ্গে কিছুটা ভালবাসাবাসি, সে যদি যেতে যেতে কোনও কিশোরকে বাড়ির কাছে পৌঁছে দেয়, কবেকার কথা সব, তথাকথিত মনোজের মা যদি জানলায় রোজ দেখে, মেয়েটি তার পুত্রকে বাড়ির কাছে দিয়ে অন্য রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে, ভাবতেই পারে, তথাকথিত মনোজের বান্ধবী— একসঙ্গে বড় হচ্ছে এবং কোনও এক সুসময়ে শরীরে শরীর মিশে যাবে, মনোজের মা ভাবতেই পারে, ইস্, মেয়েটা যদি তার পুত্রকে ধরে রাখতে পার ত, পুত্রের এই প্রবাস জীবনের জন্য তাকেই দায়ী ভাবতে পারে— তার তবে মিষ্টির মতো নাতনিটি ঘর আলো করে থাকত। কাজেই মনোজের মাকে সে চিনতে না পারে, তবে মনোজের মা তাকে চেনেন। এই সব আবোলতাবোল ভাবনায় সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে মনে হচ্ছিল, সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

তখনই একজন বলল, কাকে খুঁজছেন?
চার নম্বর ঘর।
তিনি তো ঘরে নেই।
কোথায় গেছেন?
জানি না।

ছায়া অনুগামী

মতি নন্দী



মিষ্টির বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বেরোবার দিন, অফিস রওনা হবার আগে পরমেশ তাকে বলল, ‘যদি প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে থাকো, তা হলে নিক্কোপার্ক নয়তো সায়াস সিটি, সাত জনের মধ্যে থাকলে চিড়িয়াখানা আর দশ জনের মধ্যে থাকলে...’ তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী বলে ওঠে, ‘গঙ্গায় নৌকায় চড়ে বেড়ানো কিংবা ভিক্টোরিয়া নয়তো বটানিক্যাল গার্ডেন, তাই তো? কোলকাতায় বাচ্চাদের নিয়ে ঘোরার জায়গা তো হাতে গোনা এই কটা।’

পরমেশ টাইটা নেড়েচেড়ে আলগা করে নিয়ে বলল, ‘ইচ্ছে করলেই ঘোরার জায়গা বার করে নেওয়া যায়। আচ্ছা, তুমি কখনও লালদিঘির আশেপাশে অফিস পাড়াটা দেখেছ?’ ‘বাসে করে যাবার সময় যতটুকু দেখা যায়, দেখেছি।’ ‘তুমি কি জানো, এখানে বহু বাড়ি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের, বাড়িগুলোর সঙ্গে বাংলার একটা আমলের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তাদের স্থাপত্যও দেখার মতো, প্রিজার্ড করে রাখার মতো। এগুলোই দেখার জিনিস— পুরনো কোলকাতা। মিষ্টি, চিৎপুর দিয়ে তোকে ট্রামে করে নিয়ে যাব শ্যামবাজার থেকে লালদিঘি, দেখবি কত রকমের মানুষ, বাড়িঘর, দোকান, অবাক হয়ে যাবি। পরীক্ষার রেজাল্ট যাই হোক, সামনের রোববারই বেরি য়ে পড়ব, যাবি? চিনে রেস্টুরেন্টে খেয়ে বাড়ি ফিরে আসব।’ মিষ্টি বড় করে ঘাড় নেড়ে বলল, ‘মা যাবে?’ ‘কী করে যাবে? আমরা তো হাঁটব, তিন মাইল, চার মাইল, তোর মা কি পারবে? মোটা মানুষের অত হাঁটলে কষ্ট হবে না?’

বলেই পরমেশ ব্রিফকেসটা হাতে তুলে আড়চোখে ইন্দ্রাণীর দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

‘নিজের ভুঁড়িটার দিকে একবার তাকিও।’ ঝাঁঝালো স্বরে কথাটা বলেই সে যোগ করল, ‘বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে নাগেরবাজার, সেখান থেকে অটোয় দমদম স্টেশন, মেট্রোয় কালীঘাট আবার বাস কিংবা অটো। সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘোরাঘুরি করে সময় কাটানো, তারপর বাড়ি ফেরার জন্য রিপিট পারফরম্যান্স, মোটা হওয়ার কোনও সুযোগ আছে? তুমি তো গাড়ি চড়া লোক। আমার অর্ধেক ফিটনেসও তোমার নেই।’ এক নিঃশ্বাসে বলে ইন্দ্রাণী গনগনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মিষ্টি চোখ বড় করে মার মুখ দেখছে।

পরমেশ সদর দরজার নব ঘুরিয়ে বলল, ‘পরশু বলেছিলে পঞ্চাশ কেজি, জন্মদিনের পোশাকে। বেঁটে মেয়েদের পক্ষে ওটা মোটাই।’

দু’ বছর আগে পরমেশ একটা ওজন মাপার যন্ত্র কিনে আনে। স্বামী স্ত্রী ও মেয়ে মাসে দু’বার নিজেদের ওজন নিয়ে একটা নোট বইয়ে লিখে রাখে এবং এই নোট বইয়ের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয় রান্নাঘরের উত্থান ও পতন।

‘প্রথমে হলুম মোটা এখন বেঁটে।’ ঠোঁট কামড়াল ইন্দ্রাণী। ‘তোমাদের সচিন তেডুলকরের থেকে এক ইঞ্চি লম্বা, তা জানো?’

‘তাতে কী প্রমাণ হল? তুমি লম্বা? যদি বলি সুনীল গাওস্করের থেকে আমি দু’ ইঞ্চি লম্বা তা হলে কি আমি লম্বা হয়ে যাব?’ পরমেশ তার বদমাইশি মাখা চাহনি ইন্দ্রাণীর ছিপছিপে নিঃসর্মে দেহের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে ব্যস্ত স্বরে বলল, ‘মোটা-বেঁটে ব্যাপারটা খুব জটিল পরে ডিসাইড করা যাবে। তুমি কিন্তু রেজাল্ট জেনেই অফিসে ফোন করবে।’

দুরন্দুর বৃকে ইন্দ্রাণী অপেক্ষা করেনি কেননা সে জানে বুদ্ধিমতী, নিয়মিত পড়াশোনা করা মিষ্টি অবহেলায় পাশ করবে। তবে কৌতূহল একটা ছিল স্থানটা সবার মধ্যে কত উপরে হবে!

রিপোর্ট কার্ড হাতে মুখে হাসির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে মিষ্টিকে ছুটে আসতে দেখেই ইন্দ্রাণী বুঝে গেল স্থানটা উপরের দিকেই হয়েছে।

‘মা মা, নিক্কোপার্ক।’ হাঁপাতে লাগল মিষ্টি।

‘মিসেস দত্ত, মেয়ে পাশ করেছে?’ গার্গী লাহিড়ি একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করল।

শুনেই হাড়পিণ্ডি জ্বলে উঠল ইন্দ্রাণীর। পাশ করবে না তো কি ফেল করবে? যার মা বি এসসি কেমিস্ট্রি অনার্স, বাবা এম কম ফার্স্ট ক্লাস, সে মেয়ে অনেক চেষ্টা করলে তবেই ফেল করবে। গার্গী লাহিড়ির মুণ্ডুটা কড়মড় করে চিবিয়ে ইন্দ্রাণী হেসে বলল, ‘করেছে, আপনার ছেলে?’

‘পাশ করেছে, ক্লাস টু হল। এদিকে এক বিপদ, অর্কর আন্টির বিয়ে এই বোশেখে, শ্বশুর বাড়ি পটনায়। এখন আমায় নতুন টিউটর খুঁজতে হবে।’ গার্গীর চোখে বিপন্নতা ঘনাল। ‘সত্যিই দেখছি বিপদে পড়লেন। ক্লাস টুউউউ বলে কথা। টিউটর ছাড়া তো চলবেই না।’ তখনই ইন্দ্রাণীর চোখ পড়ল মনোজের মায়ের উপর। এই প্রৌঢ়ার নাম সে এখনও জানে না। কাঁধে হলুদ কাপড়ে খয়েরি বাটিক নক্সার একটা ঝোলা। ইন্দ্রাণী এটা আগে দেখেনি। ঝোলাটা পুষ্ট নয় ভিতরে, সামান্যই জিনিস রয়েছে। সেই সাদা শাড়ি, সেই আধ ঘোমটা, সেই উজ্জ্বল চোখ। ওদের দিকেই এগিয়ে আসছেন।

‘আজ রেজাল্ট বেরোবে জানতাম।’

কাছে এসে প্রৌঢ়া মিষ্টির খুতনি ধরে নেড়ে দিলেন। ‘ভাল করে পাশ করেছে তো?’

ইন্দ্রাণী বলল, ‘সেকেন্ড স্ট্যান্ড করেছে।’

‘ওরে বাবা, সেকেন্ড! তা হলে তো তোমাকে কিছু একটা উপহার দিতে হয়।’ তিনি ঝোলার মুখ ফাঁক করে ভিতরে হাত ঢোকালেন। ইন্দ্রাণী চকোলেট রঙের মলাটে বাঁধানো ডায়রির মতো একটা খাতা দেখতে পেল। খোঁজাখুঁজি করে বার করে আনলেন একটা নীল রঙের পার্কার বল পয়েন্ট কলম। মিষ্টির দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, ‘নাও।’

ইতস্তত করে মিষ্টি তাকাল মায়ের দিকে। প্রৌঢ়াও তাকালেন ইন্দ্রাণীর দিকে। চোখে মিনতি অনুনয়। যেন বলতে চাইছেন, আমাকে ফিরিয়ে দিও না, ওকে নিতে বলো।

‘দিদা দিচ্ছেন, নাও।’



দিদা! ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে গেল। শব্দটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল হঠাৎ। ইনি তার মায়ের বয়সী তো বটেই। কিন্তু মায়ের বয়সী তো আরও কত মহিলাকে সে চেনে, তাদের কাউকে তো তার মিষ্টির দিদা হবার যোগ্য মনে হয়নি। তা হলে কি সে মনে মনে এমন সৌম্য সুশ্রী ধীর অনুচ্চ কণ্ঠী, স্নেহময়ী কাউকে কল্পনায় মায়ের আসনে বসিয়ে রেখেছে। শুনেছেন তার তিন মাস বয়সে মারা যায় মা, তার চার মাস পর বাস দুর্ঘটনায় বাবা। সে মানুষ হয়েছে মামার বাড়িতে। প্রথমে ছোটমাসি, পরে নন্তু মা মার কাছে। স্মৃতিতে মা অনুপস্থিত।

মিষ্টি কলমটা নিল। ইন্দ্রাণী চোখ টিপে দৃষ্টি নীচে নামাল। ইশারাটার অর্থ মিষ্টির জানা, সে প্রৌঢ়াকে প্রণাম করে মাকেও করল।

মিষ্টিকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলে উঠলেন, ‘আরে আরে আরে আমার নাতনিটা কী সুন্দর। কতকাল পরে প্রণাম পেলাম।’ তার চোখ ছলছল করে উঠল।

ইন্দ্রাণী টের পেল তার গলার কাছে জমে উঠেছে একদলা বাতাস। তাদের দু’ পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে উৎফুল্ল ছেলেমেয়েদের নিয়ে তৃপ্ত মুখে মায়েরা। খুব হাঁদা ছেলেমেয়ে না হলে নিচু ক্লাসে কেউ ফেল করে না। কেউ বাড়ির গাড়িতে উঠছে, বেশির ভাগই যাচ্ছে বাস স্টপের দিকে। স্কুল পড়ুয়াদের জীবনে আজ একটা বিশেষ দিন। বড় হওয়ার সিঁড়িতে ওরা একধাপ উঠল।

এইবার ইন্দ্রাণীর চোখ পড়ল প্রৌঢ়ার চশমায়। ডান দিকের কাচটায় চিড় ধরা। গালে শুকিয়ে আসা ছড়ে যাওয়ার দাগ।

‘চশমার কাচটা ফেটে গেল কী করে? পড়েটড়ে গেছিলেন না কি?’
বিব্রত দেখাল প্রৌঢ়াকে, ‘হ্যাঁ।’

এর বেশি আর কিছু জানালেন না। ইন্দ্রাণী সচরাচর যা করে না, কৌতূহলী হয়ে বলল, ‘কোথায় পড়েছিলেন, বাথরুমে না সিঁড়ি দিয়ে? গালেও তো ইনজুরির দাগ দেখছি।’
‘রাস্তায়। চলো এগোই, তুমি তো অটো ধরে কালীঘাট স্টেশনে যাবে, আমি গোলপার্কে যাব।’

‘রাস্তায় পড়ে গেছিলেন কী ভাবে?’
‘অজ্ঞান হয়ে শান্তি নীড়ের কাছেই।’

‘এপিলেপসি, মৃগী?’

‘না, ইসকেমিক হার্ট। দু’ মাস আগেও এমন হয়েছিল, সেবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি একটা কাপড়ের দোকানে। বিনা নোটিসে আচমকা হঠাৎ মাথার মধ্যে ব্ল্যাক আউট, সাত-আট সেকেন্ডের জন্য। কী লজ্জার ব্যাপার বলো তো, এত লোকজনের মধ্যে; দোকানদার তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিল। তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গেল কাছেই এক ওষুধের দোকানে, ওখানকার ডাক্তার বললেন ই সি জি করাতে। শান্তি নীড়ের কাছে এক ডাক্তার থাকেন, গেলাম তাঁর কাছে, তাঁর ই সি জি মেশিন আছে। পরীক্ষা করে বললেন, আর্টারি বুজে গেছে, রক্ত যাচ্ছে না, তাইতে হার্টের মাসল দুর্বল হয়ে গেছে।’

শ্রৌটা একটানা বলতে বলতে মন্তরভাবে হাঁটছেন। ইন্দ্রাণী মাথা নামিয়ে শুনে যাচ্ছে। মিষ্টি হাঁটছে দোকানগুলোর দিকে গোয়েন্দা চোখ রেখে। একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে সে থমকে দাঁড়াল। কয়েক গজ এগিয়ে ইন্দ্রাণীও দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়ের দিকে ফিরে তাকাল। হাতছানি দিয়ে মিষ্টি ডাকছে।

‘মা, ওই দ্যাখো বড় ক্যাডবেরি।’

ইন্দ্রাণী দোকানে সাজানো সম্ভার তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে বলল, ‘অনেক দাম, আমার কাছে অত টাকা নেই, বাবাকে বলো।’ তারপরই সে এগিয়ে গেল দোকানের দিকে।

‘ওই ডট পেনের দাম কত?’

ইন্দ্রাণীর আঙুল দেখানো কলমটা তুলে দোকানি বলল, ‘কুড়ি টাকা।’

‘দিন। আর ওই ক্যাডবেরির বাস্কাটা কত?’

‘পঁচানব্বই টাকা।’

‘আর একটু কমে?’

‘পঁয়তাল্লিশ, পঁচিশ, পনেরো...’

‘পঁয়তাল্লিশেরটা দিন।’

মিষ্টির হাতে চকোলেট ধরিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, ‘রাস্তায় খাবে না।’ তারপর সে শ্রৌটার কাছে কলমটা এগিয়ে ধরে বলল, ‘না বলবেন না। আপনার কলমটা মনে হচ্ছে আপনার দরকারের কলম। আপনার ঝোলায় ডায়রির মতো একটা খাতা দেখেছি, বোধহয় কিছু একটা লিখছেন। এবার আমার এই কলমটা দিয়ে লিখুন।’

শ্রৌটা হেসে ফেললেন, ‘ঠিক ধরেছ, গত একমাস ধরে লিখছি। আমার আরও একটা কলম আছে তবে এটা আমি রেখে দেব।’

‘কতদিন হল লিখছেন? আপনার কি লেখালিখির অভ্যাস আছে?’

‘একদম নেই, জীবনে একটা ছড়াও লিখিনি। সেই অজ্ঞান হয়ে পড়ার পরই মনে হল এবার কিছু কথা লিখে রেখে যাই।’ একটু থেমে চিন্তিত স্বরে যোগ করলেন ‘নিজের কথা।’

ওকে কেমন যেন আনমনা দেখাল, ইন্দ্রাণী মনে মনে বলল, ডায়রিতে মানুষ নিজের ছাড়া আর কার কথা লিখবে। যে কথা কাউকে বলা যায় না, মনের অন্ধিসন্ধিতে চোরের মতো ঘুরে বেড়ায়, সে সব ঘটনা, সংলাপ তাদের একে একে গ্রেফতার করে ডায়রিতে কয়েদ করে রেখে দেওয়ার জন্যই তো এই সব লেখালিখি; মারা যাওয়ার পর ডায়রিটা কারও হাতে পড়বে। পড়ে সে...

‘তোমরা তো এবার পশ্চিম দিকে যাবে, আমি যাব দক্ষিণে।’ গড়িয়াহাট মোড়ে দাঁড়িয়ে কথাটা বলেই শ্রৌটা ব্যস্ত পায়ে গোলপার্কেঁর দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। ওঁর এইভাবে বিদায় না জানিয়ে চলে যাওয়ায় ইন্দ্রাণী অপ্রতিভ বোধ করল। একটু রাগও হল। ঠিক করল এর পরে দেখা হলে সেও উপেক্ষা করবে।

বাড়ি পৌঁছেই ইন্দ্রাণী ফোন করে পরমেশকে জানিয়ে দিল মিষ্টির পরীক্ষা পাসের খবরটা। সেই সঙ্গে একটা চাপা ধমকও দিল, ‘মুখে আগল রেখে কথা বলবে, মিষ্টি এখন আট বছরে, অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। জন্মদিনের পোশাকে মা ওজন নেয় শুনে যদি বায়না ধরে সেও অমন পোশাক পরবে, তখন?’

পরমেশকে জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে ইন্দ্রাণী শোবার ঘরে এসে দেখল মিষ্টি বিছানায় শুয়ে। হাতে মোড়ক না খোলা চকোলেট। এটা একটা ঘটনা বটে, এতক্ষণ তো অর্ধেক শেষ হয়ে যাওয়ার কথা!

‘কী ব্যাপার, চকোলেটে অরুচি?’

‘ভাল লাগছে না।’ নাকি সুরে মিষ্টি বলল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণীর সন্দেহ হল বোধহয় জ্বর এসেছে। কপালে হাত রেখেই ভ্রু কুঁচকে উঠল। বেশ গরম। থার্মোমিটার দিয়ে তাপ মাপল। ঠিক একশো। মাস ছয়েক আগে হঠাৎই জ্বর হয়েছিল মিষ্টির। একশো তিন পর্যন্ত তাপ উঠেছিল। এই বাড়ির আরও দুটো ফ্ল্যাটের বাচ্চারও তখন জ্বর হয়েছিল। এ সব নাকি শরীরে ভাইরাস ঢুকলে হয়।

‘রাতে গরম দুধ ছাড়া আর কিছু খেয়ো না। দেখি কাল সকালে কেমন থাকে।’ মিষ্টির হাত থেকে চকোলেট তুলে নিল ইন্দ্রাণী।

পরমেশ ফিরল অন্য দিনের থেকে একটু তাড়াতাড়িই। হাতে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। তার মধ্যে প্রায় এক হাত লম্বা ঘাঘরা পরা পুতুল। ব্যাটারির বোতাম টিপলে কোমর দুলিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নাচে আর গান হয় ‘চুম্মা চুম্মা।’ মিষ্টি খুব খুশি। বিছানায় শুয়ে মাকে বারবার বলল পুতুলটাকে চালাতে।

‘জ্বর সারুক তারপর নিক্কোপার্ক যাব, সায়াঙ্গ সিটিতেও যাব।’ ওকে আশ্বস্ত করল পরমেশ।

পরদিন জ্বর উঠল একশো তিন-এ। ইন্দ্রাণীর কপালে ভাঁজ পড়ল। মিষ্টির মাথায় আইস ব্যাগ দিয়ে ঠিকে কাজের বউ গোপাকে ব্যাগটা ধরে রাখতে বলে সে পরমেশের অফিসে ফোন করল।

‘মিষ্টির জ্বর এখন একশো তিন। মাথায় বরফ দিচ্ছি। তুমি একবার শান্তিদিকে ফোন করে জেনে নাও কী করব?’

পরমেশ বলল, ‘এখন তো উনি ফুলবাগানে চিলড্রেন্স হসপিটালে। ওকে ধরব কী করে? সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে ফোন করব। ততক্ষণ সামলে নাও।’

ঘর থেকে গোপা ডাকল, ‘ও বউদি, একবার এসে দেখে যাও তো।’

ইন্দ্রাণী ঘরে আসতেই সে বলল, ‘মিষ্টির মুখের ভিতরটা দ্যাখো মনে হচ্ছে হাম হয়েছে।’

মিষ্টির গালে ঘাড়ে ঘামাচির মতো দুটো লাল ফুসকুরি। রাতে পরমেশ তার বন্ধুর দিদি চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাক্তার শান্তিদিকে ফোন করল। তিনি সব শুনে একটা অ্যান্টিবায়োটিক বড়ির নাম করলেন, পরমেশ লিখে নিল। ঘরে এসে সে ইন্দ্রাণীকে বলল, ‘শোনো, মেথির জল, ডাবের জল এই সব খাওয়াও, লক্ষ রাখো ঠাণ্ডা যেন না লাগে। ওষুধটা এখনই কিনে আনছি। বাচ্চাদের আকছার হাম হয়, ঘাবড়াবার কিছু নেই।’

চার দিনের দিন মিষ্টি বারান্দায় এসে দাঁড়াল, সাত দিনে ছাদে বেড়াল, এগারো দিনে মায়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে আঙুর কিনল। দু’ সপ্তাহ পর স্কুলে গেল। মিষ্টিকে পৌঁছে দিয়ে ইন্দ্রাণী

স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে এধার ওধার তাকাল। যাকে দেখবে আশা করেছিল তাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয় এই ক’দিন এসে তাদের দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন। মনে একটা খচখচানি অনুভব করা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই।

তার এবার চিন্তা সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করার। সুপর্ণাদের বাড়িতে অনেক দিন যাওয়া হয়নি। গেলে কেমন হয়! পূর্ণদাস রোড বেশি দূর নয়। ইন্দ্রাণী কলিংবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করল। হিমালীর বদলে দরজা খুলল অপরিচিতা একটি বউ। তাকে দেখেই সে বুঝল কাজের লোক এবং নতুন।

‘বাড়িতে কেউ নেই? মাসিমা কি হিমালী?’

‘আজ সকালে বর্ধমান থেকে ফোন এসেছিল, ওরা দুজনেই তাড়াহুড়ো করে সেখানে যাবার জন্য রওনা হয়ে গেছে। বলে গেছে আজকেই ফিরে আসবে। আর অচেনা লোক দেখলে যেন দরজা না খুলি।’

‘তা হলে খুললে কেন?’

‘দরজার ফুটো দিয়ে দেখলুম মেয়েমানুষ, ডাকাত-টাকাত হলে খুলতুম না।’

সুপর্ণাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ইন্দ্রাণী সাদার্ন অ্যাভিনিউ পার হয়ে রবীন্দ্র সরোবরের একটা গাছের ছায়ায় বসল, ইচ্ছে করছিল ঘাসে শুয়ে পড়তে। একটা মেয়েকে শুয়ে থাকতে দেখলে লোকে তাকাবে, নোংরা কথাও শুনতে হবে। গল্পের বই নয়তো খবরের কাগজ সঙ্গে থাকলে ভাল হত।

এক সময় ঘড়ি দেখে ইন্দ্রাণী উঠে স্কুলের দিকে রওনা হল। অনেকটা পথ। দ্রুত হেঁটে এসে দেখল সব স্কুল ছুটি হয়েছে। তাকে দেখে এগিয়ে এল গার্গী লাহিড়ি, ‘মিসেস দত্ত, আপনার সঙ্গে এক বৃদ্ধাকে একদিন কথা বলতে দেখেছিলুম তিনি আপনার খোঁজ কর ছিলেন।’

‘কিছু বলেছেন কি?’

‘নাহ্। আপনার আত্মীয়?’

‘বড় মাসিমা।’

গার্গীর কৌতূহলকে ধামাচাপা দিয়ে সে এগিয়ে গেল মিষ্টির দিকে।

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যতটা সম্ভব উত্তর দিকে এগিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তারা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে। দমদমে নেমে বেরিয়ে যেতে সুবিধে হয়। তারা এগোচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মে ভিড়। টালিগঞ্জ থেকে ট্রেন আসবে। দাঁড়াবে। দরজা খোলামাত্র হুড়হুড়িয়ে লোক নামবে, তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে হুড়মুড়িয়ে লোক উঠবে। এমনও হয়েছে অটোমেটিক দরজা বন্ধ হতে হতে ওঠার লোকের শার্ট, জুতো বা বগলে ঝোলানো ব্যাগ আটকে গেছে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই মা-মেয়েকে ট্রেনে উঠতে হয়।

‘মা, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল।’

মিষ্টি পিছনে মুখ ফিরিয়ে বলল, ইন্দ্রাণীর চোখ তখন প্ল্যাটফর্মের কিনারে এগিয়ে যাওয়া লোকদের দিকে। ট্রেন এসে পড়েছে।

‘মা, ওই দ্যাখো দিদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।’

ইন্দ্রানী ঘুরে তাকাল। কাঁধে সেই ঝোলটা। সাদা শাড়ি, ঘোমটা খসে কাঁধের উপর। থমকে এক হাত তুলে ‘মিষ্টি’ বলে ডেকে আরও দ্রুত নামতে লাগলেন। প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই ছোট্ট চেষ্টা করলেন।

ইন্দ্রানী অবাক হয়ে প্রৌড়ার দিকে তাকাল। কী ব্যাপার! কী এমন হল যে ওকে ছুটে আসতে হচ্ছে? ট্রেন দুকে পড়েছে। যেখানে যেখানে ট্রেনের দরজা পড়বে তার সামনে জটলা।

এ কী! এ কী! প্রৌড়া আছড়ে পড়লেন প্ল্যাটফর্মে। মিষ্টি ছুটে গেল মার হাত ছাড়িয়ে। কাঁধের ঝোলটা ছিটকে পড়ল মেঝেয়। তার মধ্য থেকে ডায়রিটা বেরিয়ে এল। মিষ্টি সেটা তুলে নিয়ে থরথর করে কাঁপছে। চোখে ভয়।

ইন্দ্রানী বিমূঢ়। এখন সে কী করবে। অজ্ঞান হয়ে আছেন না মারা গেছেন? এক বলিষ্ঠ যুবক তাড়াতাড়ি প্রৌড়াকে পাঁজাকোলা করে তুলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ছেলেটি? এখানে কি ডাক্তার আছে নাকি হাসপাতালে নিয়ে যাবে?

সাত-পাঁচ চিন্তায় আচ্ছন্ন মাথা অসাড় হয়ে গেছে। ইন্দ্রানী বসার জন্য এধার ওধার তাকাল। প্ল্যাটফর্মে একটা বসার আসন খালি দেখে বসে পড়ল।

‘মা, দিদার ঝুলি থেকে এই খাতাটা পড়ে গেছে।’

সেটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্কের মতো সে মলাটটা ওল্টাল। গোটা গোটা মুক্তোর মতো অক্ষর। প্রথম লাইনে চোখ রেখেই বুকের মধ্যে জমাট হয়ে গেল বাতাস, মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে নামতে শুরু করল। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি— ‘কুস্তির যেমন কর্ণ আমারও তেমনি ইন্দ্রানী, দুজনেই কুমারী মায়ের সন্তান।’

ছায়া অনুগামী

হর্ষ দত্ত



ডায়েরি ঠিক নয়, নোটবুকের মতো ছোট দেখতে খাতাটা। সুতীর আর্তনাদে মানুষ যেভাবে হাত থেকে আগুন ঝেড়ে ফেলে দেয়, ইন্দ্রাণী খাতাটাকে সেইভাবে ছুড়ে দিতে গিয়েও পারেনি।

দু' হাতের মুঠোয় প্রাণপণ চেপে ধরে বসেছিল। মিষ্টি তখনও বিস্ময়ে বিহ্বল। বারংবার স্টেশনের সিঁড়ির দিকে ভয়াবহ চোখে তাকাচ্ছিল। ওই সিঁড়ি দিয়েই ওর দিদাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে একটা কাকু।

তরুণটির মুখ এক ঝলক দেখেছে ইন্দ্রাণী। এখন আর কিছুই মনে নেই। আবছা রেখাচিত্রও মুছে গেছে। এত দ্রুত, এত অকস্মাৎ পুরো ব্যাপারটা ঘটল যে, মনের ভেতরে কোথাও ছাপ ফেলতে পারেনি কোনও মুহূর্তই। কী আশ্চর্য!

ইন্দ্রাণী ভয়ানক অবাক হয়ে গেল। পরবর্তী ট্রেন ঠিক দশ মিনিটের মাথায় মাথায় স্টেশনে ঢুকে এসেছে। নোটবইটাকে তখনই পাশের খালি চেয়ারটায় ঠক করে নামিয়ে রেখে ইন্দ্রাণী স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে পড়েছিল। মিষ্টির ডানার কাছটায় প্রায় খামচে ধরে বলেছে, চলে আয়, আয়। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না।

বিস্ময়ের ওপর আর এক বিস্ময়ের অভিঘাতে মিষ্টি বিমূঢ় হয়ে গেছিল। মায়ের ওই ব্যবহার ওর অভিজ্ঞতার বাইরে। ট্রেনে উঠেই মা ও মেয়ে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসার জায়গা পেয়েছে। প্রায় দম বন্ধ করে কাঠ হয়ে বসেছিল ইন্দ্রাণী। বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণার বল যেন লাফাচ্ছিল, গড়িয়ে যাচ্ছিল, এমনকী হারিয়েও যাচ্ছিল পাঁজরের আশেপাশে।

মায়ের রুঢ় ব্যবহারে আহত মিষ্টি মুখ কালো করে বসে থেকেছে। একটাও কথা বলেনি।

তবে ছোট মেয়ে তো, দমদমে নেমেই ইন্দ্রাণীকে আচমকা জিজ্ঞেস করেছে, মা, দিদার খাতাটা কোথায়? তোমার হাতে দিয়েছিলাম যে!

ভয়ঙ্কর চমকে উঠেও ইন্দ্রাণী নিজেকে সামলে নিয়ে কড়া গলায় বলেছে, কেন, তোমার কী দরকার? ওটা দিয়ে কী হবে শুনি!

— বা রে, ওটা তো দিদার। ব্যাগ থেকে পড়ে গেছে। দিদাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না বুঝি। মিষ্টি যেন ককিয়ে উঠেছিল।

— চুপ কর তো! বড্ড পাকা হয়েছিস। দিদা কোন চুলোয় গেল ঠিক নেই, তার আবার ডায়েরি।

মিষ্টিকে ধমকে, দাবড়ে চুপ করিয়ে দিয়ে ইন্দ্রাণীর ভেতরটা অনেক হালকা লাগছিল। আসলে রাগটা তো ওর একমাত্র সন্তানের ওপর নয়। ওকে সেই সময়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে ওই ছোট নোটবুকের কয়েকটা পাতা।

ভদ্রমহিলা নিশ্চিত বদ্ধ উন্মাদ। পুরোপুরি মাথা খারাপ। যদিও বাইরে তার কোনও লক্ষণ নেই, প্রকাশও নেই। কিন্তু এ কথা ইন্দ্রাণীর কাছে এই মুহূর্তে স্পষ্ট, মহিলাটি বিকৃতমস্তিষ্ক। আবার শুধু মস্তিষ্ক কেন, রুচি এবং চিন্তা-ভাবনাও বিকৃত। তা না হলে ও সব কথা কেউ লিখতে পারে! ‘কুন্তীর যেমন কর্ণ, আমারও তেমনি ইন্দ্রাণী, দুজনেই কুমারী মায়ের সন্তান।’— এ কথার মানে করতে গেলে যে ওর নিজের বাবা-মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়! এর অর্থও কী ভয়ঙ্কর! ইন্দ্রাণীর জন্ম পরিচয় নিয়েই জঘন্য টানাটানি!

ডায়েরির দ্বিতীয় পাতায় খামচে খামচে লেখা আরও কয়েকটা আবোল-তাবোল বাক্যের মধ্যে একটা লাইনে ওর চোখ স্থির হয়ে গেছিল: ‘ইন্দ্রাণীর কাছে আমি সব কিছু স্বীকার কর ব। আমার দোষ, পাপ, স্বলন, অপরাধ— সব, সব। ইন্দ্রাণী কি আমাকে ক্ষমা করবে?’

এ সব হেঁয়ালিতে ভর্তি শব্দসম্ভারের কোনও অর্থই ইন্দ্রাণীর কাছে স্পষ্ট নয়। মহিলা প্ল্যাটফর্মে মুখ খুবড়ে পড়ে যাওয়ার পর পরই নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল, তার সবটুকু এলোমেলো হয়ে গেলেও ডায়েরির অক্ষরগুলো পিঁপড়ের সারির মতো ওর মাথার ভেতরে এপাশ থেকে ওপাশ বারংবার চলে যাচ্ছে।

উদ্বেগ, উত্তেজনা, ঘাম, দ্রুত নিঃশ্বাস আর সেই লুকোনো কষ্ট নিয়ে বাড়ি ফিরেই ইন্দ্রাণী পর মেশকে ফোন করেছিল।

কী ব্যাপার হাঁপাচ্ছ কেন? আবার নতুন কী ঘটল? পরমেশ ওর ফোন পেয়ে মোটেই খুশি হয়নি।

তুমি কি আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে? আমার আর ভাল লাগছে না।

কেন? কী হয়েছে বলবে তো! স্টেঞ্জ!

একটু দম নিয়ে মোটামুটি গুছিয়ে পুরো ঘটনাটা বলেছে ইন্দ্রাণী।

সব শুনে পরমেশ গভীর গলায় জানতে চেয়েছে, ভদ্রমহিলার লাস্ট অফ অল কী হল!
খোঁজ পেয়েছ? দ্যাট নোটবুক ইজ বোগাস, ইডিয়টিক। লিভ ইট, লিভ ইট।

হতাশ স্বরে ইন্দ্রাণী বলেছে, জানি না। আমি কিছু জানি না।

সে কী! মহিলার কোনও খবর নিলে না?

যে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে, তার খোঁজ নিতে হবে! বাঃ, তুমি তো বেশ বললে!

তবুও ইট ইজ আওয়ার ডিউটি। পরমেশ রুক্ষ গলায় বলেছে।

আমাকে জ্ঞান দিও না, প্লিজ। ক্ষোভে, অপমানে ইন্দ্রাণীর গলা ধরে এসেছে।

ঠিক আছে, আমি তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করব। পরমেশ তৎক্ষণাৎ রিসিভার নামিয়ে রেখেছে।

ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল। আটটা পাঁচ। আর কখন যে পরমেশ ফিরবে কে জানে! এর না
ম তাড়াতাড়ি!

মিষ্টি বসার ঘরে ভাস্বতী আন্টির কাছে আঁকা শিখছে। ভাস্বতী স্থানীয় মেয়ে। আর্ট কলেজের
ছাত্রী। ওদের অভাবী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। আঁকা শেখানোর অনেকগুলো টিউশনি করে
ভাস্বতী। একটু প্রফেশনাল, তবে ভীষণ শান্ত আর ভদ্র।

ঘরটায় উঁকি দিতেই ভাস্বতীর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর চোখাচোখি হয়ে গেল। ইন্দ্রাণী ফিকে হেসে
সরে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই সামান্য উদ্বিগ্ন স্বরে ওকে ডাকল ভাস্বতী,
বউদি, একটু শুনুন।

অগত্যা ইন্দ্রাণীকে পা রাখতেই হল এ ঘরে। মিষ্টি মায়ের দিকে এক বলকের জন্যও চোখ
তুলে তাকাল না।

—কিছু বলছ? ইন্দ্রাণীর গলা অযথা কেঁপে গেল যেন।

—ভাববেন না আপনাকে কোনও কমপ্লেন করছি। আজ মিষ্টি এমন মোরোজ হয়ে আছে
কেন বলুন তো! আমি এতবার জিজ্ঞেস করছি, কোনও উত্তরই দিচ্ছে না। একেবারে
স্পিকটি নট। ওকে তো কখনও এমন দেখি না।

মৃদু হাসতে গিয়েও ইন্দ্রাণী গভীর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, মেট্রো
স্টেশনে আজ একটা দুর্ঘটনা দেখে মিষ্টির মনের ওপরে হয়তো চাপ পড়েছে।

—দুর্ঘটনা! সুইসাইড নাকি! মেট্রো রেল আজকাল যা শুরু হয়েছে! ভাস্বতী দেহ মুচড়ে
বলল।

—না না, অতটা সিরিয়াস নয়। তবে একটা অ্যাকসিডেন্ট।

ভাস্বতী আর খুঁটিয়ে জানতে চাইল না। বরং মিষ্টির পিঠে গাঢ় হাত বুলিয়ে বলল, দূর, বোকা

মেয়ে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

এ বার মিষ্টি চোখ তুলে তাকাল ইন্দ্রাণীর দিকে। সেই চোখে এক নিষ্পাপ শিশুর তীব্র ভরসনা। যে ভরসনা সহ্য করা ঈশ্বরের পক্ষেও কঠিন। কেননা এর মধ্যে মিশে আছে শৈশবের পবিত্রতা।



ইন্দ্রাণী আর সহ্য করতে পারল না। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।
যে অজানা ত্রাস ওকে তাড়া করে ফিরছে, তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয়
মায়ের প্রতি মিষ্টির নিখাদ ঘৃণা, তা হলে ইন্দ্রাণী একেবারে শেষ
হয়ে যাবে।

আটটা সাতাশে গাড়ি থেকে নেমে ধীর পায়ে হেঁটে এসে পরে
মশ ফ্ল্যাটে ঢুকল ঠিক সাড়ে আটটায়।

ওর ভুরু কুঁচকে আছে। চোখে বিরক্তির ঝিলিক। সারা মুখে
নীলচে

আভা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট ঢিলে করতে করতে পরমেশ বলল, ডায়েরিটা
মট্রো রেল ফেলে আসা উচিত হয়নি।

ইন্দ্রাণী কোনও উত্তর দিল না। যন্ত্রণার উৎসকে জেনে শুনে কেউ বহন করে নাকি! পরমেশ
কি জানে না?

—মহিলা সম্পর্কে ওই ডায়েরিটাই একমাত্র ক্লু। ওটা সি আই ডি'দের তুলে দিলে সব স
মস্যার সমাধান হয়ে যেত। প্রবলেমটাকে নিজের ভুলে জিইয়ে রাখলে।

এ বার মুখ খুলল ইন্দ্রাণী, আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার সম্পর্কে এত খারাপ
খারাপ কথা লেখা আছে!

ক্রুর হাসল পরমেশ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, নোটবুকের ইন্দ্রাণী যে তুমিই— এ কথা ধরে নিচ্ছ
কেন? পৃথিবীতে কি আর কোনও ইন্দ্রাণী নেই?

খানিকটা রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, আইডেন্টিক্যাল বলেই
ধরে নিচ্ছি!

—সো হোয়াট? তুমি এত রিঅ্যাক্ট করছ কেন? ওই মহিলা হয়তো তোমাকে ওঁর
জানাশোনা কোনও ইন্দ্রাণী ভাবছেন। হতেই তো পারে।

একটু থামল পরমেশ। হালকা ঘামে ভেজা গোল্ফিটা খুলতে গিয়েও থেমে গেল। কী মনে
করে একেবারে ইন্দ্রাণীর সামনে এসে বলল, মহিলার সম্বন্ধে তুমি যখন আমাকে প্রথ
ম জানিয়েছিলে তখন রহস্যের গন্ধে গন্ধে আমিও একটু ইন্টারেস্ট নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন
তো মনে হচ্ছে পুরোটাই ইনিগমা।— আই মিন হেঁয়ালি।

বিচারকদের মতো জাজমেন্ট দিয়ে, শরীরের হিল্লোলে তাদ্ধিল্য প্রকাশ করে পরমেশ
বাথরুমে ঢুকে গেল।

খুব কাছের মানুষের এই ব্যবহার আরও অসহ্য। কেউ ওর সংকটটাকে ছুঁতে পারছে না। হয়তো সংকটের চেহারাটা এখনও অলীক। অনেকগুলো স্বপ্নের মতো। নাকি দুঃস্বপ্নের কাছাকাছি কোনও অনাগত ঘূর্ণি? অদূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে! লগুভগু করে দিয়ে চলে যাবে ওর সাজানো-গোছানো সুখ এবং সুখের সমস্ত অনুষ্ণ। তখন কে ওকে বাঁচাবে?

আজকাল ওর রাতের ঘুম বেশ পাতলা হয়ে গেছে। খাট থেকে পড়ে যাওয়ার স্বপ্নচমক কিংবা কোনও কোনও রাতের নৈশশব্দ ভাঙার আওয়াজ ইন্দ্রাণীর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তখন আঁধার ঘরে ইন্দ্রাণী একলা। চোখের পাতা আর বুজতে চায় না। মিষ্টির স্কুলের গেট থেকে শুরু করে দমদম মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত ওর সত্তা উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। ইন্দ্রাণী প্রাণপণ ওই মহিলাকে ওর আবাল্য স্মৃতির মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোথাও প্রৌঢ়াকে আবিষ্কার করতে পারে না। এমনকী, সামান্যতম কোনও সূত্রও উঠে আসে না ওর মনের পরত থেকে।

তখন আবার সেই কষ্টটা শুরু হয়। ইন্দ্রাণীকে প্রায় অবশ করে ফেলে। তবু ইন্দ্রাণী সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামে। বাথরুমে যায়। সারা শরীরে জলের স্পর্শ দিতে থাকে। অনেকক্ষণ। যেন এক দহনক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে হিমেল জলের কাছে টেনে এনেছে।

নিঃসাড়ে ঘুমোলেও পরমেশ্বরের অবচেতনে ইন্দ্রাণীর এই সব নৈশ চঞ্চলতা ছায়া ফেলে। তাই মানুষটা এক একদিন ওকে চমকে দিয়ে বলে, রাতের পর রাত অকারণে জেগে থাকতে থাকতে তুমি কিন্তু পাগল হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত ফিজিসিয়ানের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। দেখে নিও।

কতক্ষণ এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণীর খেয়াল নেই। ভাস্করীর গলা পেয়ে ওর সংবিৎ ফিরল।

—বউদি। আসছি। ভাস্করী দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আঁ! ও হ্যাঁ, তুমি। আচ্ছা, এসো। ইন্দ্রাণী নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করল।

—মিষ্টিকে আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে দেবেন। আঁকতে আঁকতে দু-তিনবার লম্বা হাই তুলল। সম্ভবত ফিজিক্যালি একজসটেড। দশটার মধ্যে ওকে শুইয়ে দেবেন।

সুযোগ পেয়ে ভাস্করীও ওকে খানিকটা জ্ঞান দিয়ে গেল। ইন্দ্রাণী মা। ও কি জানে না কখন মেয়েকে খেতে দিতে হবে, ঘুম পাড়াতে হবে! আজকালকার মেয়েগুলো ভারী ডেঁপো। এদের সময়মতো বিয়েও হয় না, সংসারও করতে পারে না। আবার জীবনযাপনের খুঁটিনাটি নিয়ে কত জানে— এমন একটা ভাব।

ইন্দ্রাণী নীরবে মাথা নাড়ল। ভাস্করী ওর ভাবলেশহীন মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আলতো হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

মিষ্টি পাশের ঘরে এখন রঙের বাক্স, আর্ট বোর্ড, ড্রয়িং খাতা গুছিয়ে রাখছে। কী নিঃশব্দে! অন্যদিন হলে গুনগুন করে গানের শব্দ বাতাসে ভাসিয়ে দিত মিষ্টি! চেনা ছবিগুলো আজ সব ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে। মেয়ের কাছে যেতে এখনও ইন্দ্রাণীর সাহস হচ্ছে না। কিন্তু কেন?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পরমেশ প্রতিদিনের মতো নিজের কাজকর্ম সেরে, মেয়েকে একটু আদর করে বারান্দার লাইট নিবিয়ে ওখানেই ড্রিংক্স নিয়ে বসল।

নেশা শুরু করার কিছু পরই আচমকা পরমেশ মন্তব্য করল, তুমি সায়েন্সের ছাত্রী ছিলে না! বিজ্ঞান তোমাকে এই শিখিয়েছে! তুমি তো দেখছি সুকুমার রায়ের সেই ছড়ার বেস্ট একজা ম্পল— ‘আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা— ছায়ার সাথে কুস্তি ক’রে গায়ে হল ব্যথা!’ হাঃ, হাঃ।

ডিম-আলুর ঝোল দিয়ে খুব সামান্য ভাত খেয়ে মিষ্টি সত্যিই শুয়ে পড়ল। আজ আর টিভি দেখার জন্য মোটেই বায়না করল না।

পরমেশ খাওয়ার টেবিলে এসে বসেছে। আজ সম্ভবত অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি নেশা করে ফেলেছে মানুষটা। মাথাটা ঝুঁকে আছে। ভাল করে চোখ খুলতে পারছে না। পরমেশের থালা সাজিয়ে টেবিলে রাখল ইন্দ্রাণী। জগ থেকে গেলাসে জল ঢালার জন্য হাত বাড়াতেই ফোন বেজে উঠল।

কর্ডলেস রিসিভারটা অন্য দিন এই টেবিলেই পড়ে থাকে। আজ নেই।

জড়ানো গলায় পরমেশ বলল, ফো-ন-বা-জ-ছে। ও-গো-শু-ন-ছো। যা-ও-যা-ও-আঃ...

রাত সাড়ে দশটার পর যে-সব ফোন আসে সেগুলোর আশি ভাগই পরমেশের। শেয়ার মার্কেটের দালাল থেকে ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। কিংবা ওর কোনও বন্ধু-বান্ধব। ইন্দ্রাণীর ফোনও আসে। বাবা অথবা মায়ের ফোন। কিংবা মুম্বই-ব্যাঙ্গালোর থেকে ওর ননদেরা। ওর নিজের ভায়ের সঙ্গে কথা বলতে যত না বেশি আগ্রহী তার চেয়ে বেশি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে। আসলে ওরা দূর থেকে ভায়ের সংসারের উত্তাপ নিতে চায়। টিপিক্যাল মেয়েলি স্বভাব। হয়তো ওদেরই ফোন। ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল। সাধারণত, ওরাই এই সময়ে এস টি ডি করে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিসিভার তুলল ইন্দ্রাণী, হ্যাঁ বলুন।

—এটা কি ইন্দ্রাণী দত্তের বাড়ি? একেবারে অচেনা এক কণ্ঠস্বর।

—হ্যাঁ। ইন্দ্রাণী সামান্য কেঁপে উঠল, আমিই বলছি।

—ওঃ ফাইন! আপনাদের গাড়ির নম্বর কি ডব্লু বি জিরো টু কে জিরো ফোর ফোর...

—হ্যাঁ। ...কিন্তু আপনাকে তো... ইন্দ্রাণী বিস্ময় রুদ্ধ করতে পারল না।

—আমাকে চিনবেন না। আমার নাম লালন ভট্টাচার্য। আজ দুপুরের দিকে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে এক মহিলা দৌড়তে গিয়ে পড়ে যান। আমার বন্ধু অনিমেষ ওকে তুলে নিয়ে গ্র্যান্ড ভিউ নার্সিং হোমে ভর্তি করেছে। মহিলার...

—কেমন আছেন তিনি? ওপারের অজানা লালনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ইন্দ্রাণী আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

—লেটেস্ট খবর আমি জানি না। তবে খুব ভাল নয়। ভেরি স্যাড। ওই বুড়ির সঙ্গে যে ঝোলা ব্যাগটি ছিল, তাতে কয়েকটা লুজ কাগজ পাওয়া গেছে। সেখানেই আপনার নাম আর গাড়ির নম্বর লেখা ছিল।

ইন্দ্রাণী ঠিক বুঝতে পারল না। প্রশ্ন করল, কিন্তু আমার টেলিফোন নম্বর কী করে পেলেন?



লালন হয়তো স্নান হাসল, অনিমেষের বড়দা ট্রাফিক সার্জেন্ট। ওর দাদাই কীভাবে যেন আপনাদের গাড়ির নম্বরের সূত্রে টেলিফোন নম্বরটাও বের করেছেন। আপনার হাজব্যান্ডের নাম তো পরমেশ দত্ত। গাড়ির লাইসেন্স ওঁরই নামে। আচ্ছা, ওই মহিলা কি আপনার কেউ হন?

ইন্দ্রাণীর সহসা মনে হল, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম প্রশ্নের মুখোমুখি ও এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। কী উত্তর দেবে ইন্দ্রাণী? রক্তের সম্পর্কের বাইরেও আবিষ্টে লক্ষ-কোটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছে মানুষ। আকাশের তারার মতো সেই সব রিলেশন অনন্ত, ধ্রুব।

অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই বলতে পারল না ইন্দ্রাণী। সম্ভবত ওর নীরবতায় হতাশ হয়ে, লালন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আসলে কোনও স্পেসিফিক পারটিকুলার্স ছাড়া নার্সিংহোম মহিলাকে আর রাখতে চাইছে না। এবার ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

—কোন হাসপাতাল? ভারত কণ্ঠে জানতে চাইল ইন্দ্রাণী।

—বলতে পারব না মাসিমা। আমাদের এদিকে নিয়ারেস্ট সেবা প্রতিষ্ঠান, নেক্সট পিজি। একটু থামল লালন। তারপর আবার সেই লৌহশলাকার মতো তীক্ষ্ণ, প্রাণঘাতী প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মহিলাকে চেনেন?

এবার আর নিজের টুঁটি টিপে ধরতে পারল না ইন্দ্রাণী। ক্ষীণ স্বরে বলল, হ্যাঁ।

—চেনেন! ভেরি গুড। বুড়ি এবার হয়তো বেঁচে যাবেন। মাসিমা, আপনার সঙ্গে বুড়ির সম্পর্ক, ওঁর বয়স, যোগাযোগের ঠিকানা— এই সব একটু বলুন। আমি অনিমেষকে এক্ষুনি জানিয়ে দেব। ও এখনও নার্সিংহোমেই আছে। এক মিনিট, এক মিনিট... আমি কাগজ-পেন নিয়ে আসি। ...আর হ্যাঁ, আপনি কি কাল সকালে একবার আসতে পারবেন! হাজার পাঁচেক টাকাও লাগবে।

লালন ওপাশে রিসিভার ছেড়ে একটু দূরে কোথাও হয়তো গেল। ইন্দ্রাণীর সমস্ত শরীর জুড়ে আবার সেই দাবদাহ শুরু হয়ে গেছে। তীর যন্ত্রণার তির ছুটে আসছে ওর দিকে। এক অনান্নী প্রৌঢ়া মহিলা ওকে নিয়ে সেই যে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছেন, এখনও থামছেন না। কিন্তু কেন— তা ইন্দ্রাণীর কাছে এক গভীর রহস্য। খারাপ কিংবা ভাল যে কোনও একটা উত্তর ও চাইছে। অথচ সবটাই কালো ছায়ার মতো প্রহেলিকা।

চামচ দিয়ে শূন্য কাচের গ্লাস এক নাগাড়ে বাজাতে শুরু করেছে পরমেশ। নিশ্চয়ই জল চাইছে।

ইন্দ্রাণী টেঁচিয়ে বলল, আসছি। তারপর চোয়াল শক্ত করে রিসিভারটা ফোনের ক্রাডেলে নয়, পাশে নামিয়ে রাখল। ওখানেই ওটা সারারাত পড়ে থাকবে। দ্বিতীয় কোনও ফোন আসার পথ আপাতত বন্ধ।

পরমেশ ঘোলাটে চোখ তুলে ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। যদিও মাথাটা ক্রমশ নেমে আসছে টেবিলের দিকে।

গ্লাসে জল দিল ইন্দ্রাণী। দু-এক চুমুক খেল পরমেশ। তারপর ডালের বাটিতে আঙুল চুবিয়ে উন্মাদের মতো হাসতে শুরু করল। মাত্রাতিরিক্ত নেশা করে পরমেশ কখনও-সখনও এমন মাতলামি করে। কিন্তু আজ যেন ওর এই আচরণের উপলক্ষটা স্পষ্ট। এক চরম কৌতুক ওকে পাগল করে দিচ্ছে। ইন্দ্রাণী আর পারছে না। চিৎকার করে ওর বলতে ইচ্ছে করছে, প্লিজ, স্টপ ইট।

দুম করে হাসি থামাল পরমেশ। তারপর বিস্মী ভঙ্গিতে জড়ানো স্বরে বলল, রানি, তোমার বাবাকে ফোন করছ না কেন? জিঙ্গেস করো, হু ইজ ইওর রিয়েল মাদার? আবার মায়ের পরিচয়টা জানলেই তো হবে না... তোমার বাপ কে? যাও গুরু... যাও। ...হ্যাঁ-গো— তোমার বাবা-মা বেঁচে আছেন তো!

ছায়া অনুগামী

তিলোত্তমা মজুমদার



ঢোয়াল শক্ত হয়ে গেল ইন্দ্রাণীর, হঠাৎই ওর মনে হল, দাঁড়িয়ে থাকবার মতো শক্তি নেই, ও, যেন বা, ভেঙে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে মেঝেয়। নিজেকে সংযত রাখতে চেয়ার আঁকড়াল ও। গলায় বাষ্প জমাট হয়েছে। টনটন করছে কণ্ঠ। ও কোনও মতে উচ্চারণ করল— কী... কী বলতে চাইছ তুমি?

পরমেশ সমস্ত ডাল ভাতময় ছড়িয়ে বলল— ছোটমাসি আর মেসোকে মা-বাবা বলে এসেছ এতকাল। কেন বাওয়া?

বিকৃত, স্থলিত স্বর পরমেশের। অ্যালকোহলে স্ফীত পাকস্থলীসমেত, এই মানুষটিকে চিনতে পারছিল না ইন্দ্রাণী। এই সব অসহ্য মুহূর্তের হাত থেকে পালাতে বেসিনে গিয়ে মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে থাকল ও। শুনল পরমেশ বলে যাচ্ছে— বলতেই চাও না তুমি যে তো মার মা-বাবা নেই। কেন? মাসি-মেসোর কাছে বড় হয়েছ শুনলে কি লোকে তোমাকে ছা ছা করত?

ঠাণ্ডা জলের ধারায় একটু সুস্থ হয়েছিল ইন্দ্রাণী। বলল— ছা ছা করবে কেন? কৌতূহল এড়াতেই বলা। মা-বাবার অকাল মৃত্যুর কথা বলতে ভাল লাগে কারওর? বারবার? নিত্যদিন?

— লাগবে না তো। লাগে না। যাই বলো ইন্দ্রাণী রাজেন্দ্রাণী, এই শালা পরমেশ ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। সমস্ত রহস্য আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। জ-লে-র মতো। বুঝলে? অ্যাঁ? বুঝতে পারলে?

হঠাৎ শুরু করা উন্মাদ হাসির মতো হঠাৎই কাঁদতে শুরু করল পরমেশ। তার মাথা ঝুঁকে পড়ল ভাতের থালায়। মুখের নাল, নাকের জল আর কান্না মিশে যেতে থাকল ডাল-ভাতে। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল কথা বলছিল সে। ইন্দ্রাণী, নির্নিমেষ ওর অতি পরিচিত স্বামীকে লক্ষ করে উদ্ধার করতে পারল মাত্র দু-চারটে শব্দ। আমাকে ঠকিয়েছ... ঠকালে... আঁম বোকা-পাঁঠা... হা-হা-হা...।

ভেতর থেকে কাঁপুনি উঠে এল ইন্দ্রাণীর। কী হচ্ছে এ সব? কেন হচ্ছে? ওর চেনা পৃথিবীটাকে হঠাৎই অচেনা করে দিয়েছে কোনও দুষ্ট জাদুকর! অসহায়ের মতো কেঁদে ফেলল ইন্দ্রাণী। ওর ইচ্ছে করল, সমস্ত শক্তি দিয়ে ওর চেনা পৃথিবীটাকে বুকে আগলে নেবে ও। চলে যেতে দেবে না। নষ্ট হতে দেবে না। যেন দুঃস্বপ্ন এই সব। যেন ঘুম ভেঙে গেলেই ও বুঝতে পারবে সব ঠিকঠাক আছে। পরমেশের কাছে ছুটে এল ও। জানু ভেঙে বসে পড়ল। পরমেশের কোলে মাথা রেখে বিধবস্ত ইন্দ্রাণী সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে বলল— আমি কিছু জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করো। আমাকে বিশ্বাস করো। আমার ভয় করছে। তুমি আমার সঙ্গে থাকো প্লিজ।



কান্নায় গলা বুজে এল ওর। পরমেশ বাঁ হাতে ঠেলে দিল ওকে। অবাক চোখে তাকাল ইন্দ্রাণী। পরমেশ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াচ্ছে। টলতে টলতে চলে যাচ্ছে বেসিনের দিকে। ইন্দ্রাণী, পরমেশের ঠেলে দেওয়া, বিশ্বাস করতে পারেনি তখনও। ওর চোখে পড়ল, পরমেশের গাল। সবুজাভ। কালো চুলগুলি এলোমেলো। ওর মনে পড়ল, আজও, দাড়ি কেটে মসৃণতার পরশ নিতে ইন্দ্রাণীর গালে গাল ঘষেছিল পরমেশ। মানুষ কি এত দ্রুত বদলে যায়? যাওয়া সম্ভব? ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। একটি

কথাও আর না বলে শোবার ঘরে চলে গেল পরমেশ। খাবার পড়ে রইল টেবিলে। ফ্রিজে উঠল না। অন্য দিনের মতো কোলনের জলে গা ধুয়ে ঘুমোতে যাওয়া হল না ইন্দ্রাণীর। পায়ে পায়ে ব্যালকনিতে চলে গেল ও। মিষ্টির জন্য আগাগোড়া থিলে ঘিরে ফেলা হয়েছিল ব্যালকনিটা। এক পাশে আঙুরলতা জড়িয়ে উঠছে। ইন্দ্রাণীর সাজানো সংসার। আবার কান্না পেল ওর। গার্ডেন চেয়ারে শুক বসে থেকে কিছুক্ষণ অশ্রুপাত করল ও। রাত্রি এখন দ্রুত গাঢ় ও নিঃশব্দ হয়ে উঠছে। আর নিজেকে একা লাগছে ইন্দ্রাণীর। মা ছিল না, বাবা ছিল না, নন্তুমা মা-ছোটমাসি-মেসোই ওর সব ছিল। কিন্তু অভাববোধ ছিল না ওর। একাকিত্ব ছিল না। ওর মাসিই ওর মা ছিল। মা কি আরও অন্যরকম কিছু হয়? আরও গভীর কিছু? আধঘোমটা দেওয়া বিষণ্ণ মূর্তিটি মনে পড়ল ইন্দ্রাণীর। রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল ও। আর তোলেনি। নিজের অস্বাভাবিক স্বার্থ-পরতায় গা গুলিয়ে উঠল ওর। আস্তে আস্তে উঠে এল ও এবার। মুখ খুবড়ে থাকা ফোন তুলে কুঁ কুঁ শুনল কিছুক্ষণ, তারপর ডায়াল করতে থাকল।

ছোটমাসি নয়, ফোন তুললেন মেসো। তাঁর ঘুম ভাঙা গলায় স্পষ্ট উদ্বেগ— হ্যালো! কে?

ইন্দ্রাণী চাপা গলায় বলল— আমি বলছি বাবাই।

— ও। রানি? এত রাতে? কিছু হয়নি তো?

একঝলক এদিক-ওদিক তাকাল ইন্দ্রাণী। এত রাত মানে? কত রাত? ইফেল টাওয়ারের মতো দেখতে ঘড়িটার দিকে তাকাল। দুটো দশ। মেসো আবার বললেন— কীরে? কথা বলছিস

না?

ইন্দ্রাণী বলল— মাম্ কি ঘুমোচ্ছে বাবাই?

— তা তো ঘুমোবেই রে। অনেক রাত পর্যন্ত পরীক্ষার খাতা দেখেছে তো। ডাকব ওকে? কথা বলবি?

— হ্যাঁ।

একটু পরেই ছোটমাসির গলা পেল ইন্দ্রাণী। তিনিও, মেসোর মতোই উদ্বিগ্ন— কীরে? কী হয়েছে?

— মাম্, তোমরা তো বলেছিলে আমার মা আমার তিন মাস বয়সে মারা গেছে আর বাবা সাত মাসে, না?

— হ্যাঁ। ঠিকই তো। কেন?

— এগুলো কি সত্যি কথা মাম্? আমার মা-বাবা কি সত্যি নেই?

— এত রাতে এ সব কী কথা রে রানি? তোর কি মাথা খারাপ হল? এত দিন বাদে এ কথা উঠছেই বা কেন?

— আমাকে তোমরা তোমাদের মা-বাবা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলে কেন, মাম্?

— তোর কী হয়েছে মা? আমাকে বল্ রানি। এই মাঝরাত্রে তুই এ সব বলছিস কেন?

দু' চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে ইন্দ্রাণীর। কিন্তু ওর কান্নায় এখন আর কোনও উচ্ছ্বাস নেই। ও প্রায় স্বাভাবিক গলায় বলল— জানতে ইচ্ছে করছে।

— পরমেশ্বরের সঙ্গে কিছু হয়েছে তোর?

— মাম্, আমি রাখছি। যদি মনে করো আমাকে কিছু বলার আছে, বলা হয়নি, তবে ডেকো আমাকে।

লাইন কেটে দিল ইন্দ্রাণী। রিসিভারটাও নামিয়ে রাখল আবার। এই মুহূর্তে আর একজনের সঙ্গেও ওর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আবার ব্যালকনিতে গেল ও। ছোটবেলার কথা মনে করে কোথাও কোনও অসঙ্গতি আছে কি না বোঝার চেষ্টা করতে থাকল। কেউই তো ক ম ভালবাসেনি ওকে! কেউ এতটুকু অবহেলা করেনি। মাম্, বাবাই, ওর ছোটমাসি আর মেসো, ওর মাসতুতো ভাই রণজয়ের চেয়ে ওকে কোথাও কম স্নেহ করেনি। নতুনমামার ও চোখের মণি ছিল। এই অতিরিক্ত স্নেহই কোনও রহস্য আবৃত করে আছে? একবার শোবার ঘরে গেল ও। অঘোরে ঘুমোচ্ছে পরমেশ। বুকের কাছে মিষ্টি। বাবা আর মেয়ে। কী সুন্দর সম্পর্কের ছবি! কিন্তু কোনওই কি মানে আছে এ সবার? যে কোনও দিন, যে কোনও সময় মুহূর্তে বদলে যেতে পারে অসহ অবস্থানে। ইন্দ্রাণীকে যে জন্ম দিয়েছিল, সে যদি ওই মহিলাই হয়ে থাকে তবে সেই ভ্রষ্ট মা সন্তানের পরিচয় দিতে পারেনি। মা ও মেয়ের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপুল সমাজ। ইন্দ্রাণী নিজেও মিষ্টিকে জন্ম দিয়েছে। কোনও রহস্য নেই এর

মধ্যে। কোনও অবিশ্বাস নেই। কিন্তু মাঝখানে পরমেশ। ইন্দ্রাণীর মেয়ে পরমেশ দ্বারা পরিচিত, ইন্দ্রাণী দ্বারা নয়। কারণ ইন্দ্রাণীও পরমেশ দ্বারাই পরিচিত। সারা রাত্রি ব্যাপী, এই পৃথিবীতে, একেবারে নিজস্ব একটি পরিচয়ের জন্য ছটফট করতে থাকল ইন্দ্রাণী। মা হয়ে যাওয়া এই ভরা বয়সে, সুখ-স্বস্তি-পরিচিত-অভ্যস্ত জীবনের ছাঁচে ফেলা বয়সে, রাত্রি জেগে কিছু কিছু সংকল্প করল ইন্দ্রাণী। এবং, ভোর হতে থাকা আকাশের স্তিমিত তারাদের দিকে চেয়ে বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল ওর। ওই প্রৌঢ়া মহিলা, যাকে গত পনেরো ঘণ্টায় ও সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেছে, তার জন্য চোখে জল চলে এল। অ্যালবামে সাজানো ছবির মতো পর পর ও মনে করতে চাইল লাভণ্য কিংবা ভালদিদি কিংবা অন্য কোনও নামের ওই মহিলার সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাতের কথা। প্রথম যেদিন লক্ষ করেছিল সদ্য প্রৌঢ়ত্ব পেরোনো মহিলাকে সেদিন প্রথমে ছিল বিস্ময়। এবং, কোথায় ওর মনে হয়েছিল মহিলাকে যেন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বার্ষিক্যের কাছাকাছি এলেও তাঁর শরীর ভাঙেনি। ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রং মাজা মাজা। পরনের শাড়িটি সাদা ছিল কিন্তু মলিন ছিল না। মাথায় আধখানা ঘোমটা। চুল সব পাকেনি। ওঁকে দেখে দুঃস্থ বা অভাবীও মনে হয়নি ইন্দ্রাণীর। বরং মনে হয়েছিল, চশমা পরা চোখ দুটিতে মার্জিত রুচির ছাপ আছে।

ইন্দ্রাণী তাঁকে প্রথম লক্ষ করেছিল গোলপার্কে একটি মিষ্টির দোকানের বাইরে। ওর স্পষ্ট মনে আছে, এক বাত্স সন্দেশ কিনে বেরিয়ে আসছে, মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন ফুলের দোকানের পাশে। ওঁর ব্যগ্র ছবি দেখে ইন্দ্রাণী ভেবেছিল মহিলা ওকে খুব চেনা কেউ বলে ভুল করেছেন। দ্বিতীয় দিন, ও মহিলাকে দেখতে পায় বাসস্টপে। তার পর... তারপর... স্পষ্ট মনে করতে পারছিল না ইন্দ্রাণী। সম্ভবত গড়িয়াহাটের মোড়ে দেখেছিল তৃতীয়বার। এই দেখার পর থেকেই ইন্দ্রাণীর মধ্যে



ওই মহিলা সম্পর্কে একটি জেদি কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। ইন্দ্রাণী শক্তভাবে চেপে ধরল দু' গাল। ও যদি এড়িয়ে যেত, যদি রহস্যময়তাকে পাশ কাটিয়ে যেত তবে আজকের এ রকম দিনে ওকে পৌঁছতে হত না। ওর সন্তানের পিতাকে বলতে হত না যে সে ঠকে গেছে। ওর স্বাভাবিক সংসারে কোনও লুকোনো গুহা ছিল না। ওর মনে হল, ও নিজেই এই অন্ধকার তৈরি করেছে। সমস্ত ঘটনার প্রতি একটি ভাসমান দৃষ্টিভঙ্গি ওকে শ্রোতের বিরুদ্ধে চেপে ধরে দম বন্ধ করে মারছে। তেষ্ঠায় বুক শুকিয়ে গেল ইন্দ্রাণীর। ফ্রিজ থেকে বোতল বার করে ঠাণ্ডা জল সরাসরি গলায় চালান করে দিল ও। তেষ্ঠা মিটছে না তবু। আসলে, ও বুঝতে পারছে, এটা অস্থিরতা। ওই এক মহিলা সম্পর্কে বিস্ময়, কৌতূহল, অস্বস্তি, ভয়, সমস্ত ছাপিয়ে এখন ওর মধ্যে ঘৃণা আর যন্ত্রণার দারুণ দাপাদাপি। চারপাশে তাকাল ও। ওর হাতের ছোঁয়া। ওর রুচিতে গড়া। ওর সংসার। ওর নিজের। ঘরের দক্ষিণ কোণে ফ্রিজের মাথায় লাফিং বুদ্ধ। দু' হাত তুলে হাস্যমুখ। সৌভাগ্য আনার জন্য ঘরে প্রতিষ্ঠিত। কিছুক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে, চার ইঞ্চির লাফিং বুদ্ধকে টোকা মেরে শুইয়ে দিল ও।

আলো ফুটতেই চুলে চিরুনি বুলিয়ে একটি খোঁপা করে নিল ইন্দ্রাণী। হালকা সবুজ একটি শাড়ি পেল হাতের কাছে, পরে নিল। ওর রোজকার ব্যাগে কিছু টাকা নিয়ে আলমারির সামনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। চেকবই নিল। একবার ফিরে তাকাল ঘুমন্ত মিষ্টির আর পরমেশের দিকে। একবার ভাবল, ছোট চিরকুট লিখে রেখে যায়, সকালে উঠে মিষ্টি হয়তো ওকে চাইবে। কাঁদতেও পারে। পরক্ষণেই শক্ত হয়ে গেল ও। ইচ্ছে-অনিচ্ছের টানা-পোড়েন ফুরোতে না

ফুরোতেই দরজা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এল। একটু হাঁটতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ও। না মটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে... গ্যাভ ভিউ... গ্যাভ ভিউ... কলকাতার প্রথম সারির নার্সিংহোমগুলোর একটি। ড্রাইভারকে এলাকা আর নামটা বলতেই মাথা নাড়ল লোকটা। স্বস্তিতে গা এলিয়ে দিল ইন্দ্রাণী।

গম্ভীর মুখে তাকালেন মি. জানা। গ্যাভ ভিউয়ের রেসিডেন্সিয়াল সুপারভাইজার। রোগীদের স্নান করানো এবং মেঝে পরিষ্কার করার কাজ চলছিল তখন। ভিজিটিং আওয়ারের বাইরে এসে বিপদে পড়েছিল ইন্দ্রাণী। লালন ও অনিমেষের সূত্র ধরে বলতে ভ্র-কুটিল গাম্ভীর্যে তাকিয়েছেন ভদ্রলোক। বললেন— হ্যাঁ, এখানে আছেন। আমরা রাখতে চাইনি, কিন্তু অনিমে মমবাবুর দাদা বলাতে আমরা আর ট্রান্সফার করাইনি। অবস্থা ভাল ছিল না তো। অবশ্য তাতে কিছু লাভ হল না। ইন্দ্রাণী কোনও মতে বলল— কেন?

— ভোরবেলা উনি এক্সপায়ার করেছেন। আচ্ছা, আপনি কে হন?

— আমি... আমি...

দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল ইন্দ্রাণী। ওর হাত ধরে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিল একজন নার্স। মি. জানা সামনে এসে বললেন— স্যরি! আমার বোঝা উচিত ছিল। আপনি হয়তো ওঁর নিকটাত্মীয়! বড় দেরি হয়ে গেল আপনার!

ধীরে ধীরে শান্ত হল ইন্দ্রাণী। মি. জানাকে বলল— কাগজপত্র কিছু লেখার আছে?

— হ্যাঁ। তবে অনিমেমবাবু আর ওঁর দাদাকে খবর দেওয়া হয়েছে। ওঁরা আসুন... বুঝতেই পারছেন...

— কখন গেলেন?

— চারটে বত্রিশে।

— আরও দু-তিন ঘণ্টা, না?

— হ্যাঁ। ভেতরে যাবেন? দোতলায় একশো দুই নম্বর।

মাথা নাড়ল ইন্দ্রাণী। এখন নয়, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওর বাকি আছে। সেটাই ও আগে করতে চায়। ঘড়ির দিকে তাকাল ও। ঠিক ক'টায় নাগেরবাজার থেকে বেরিয়েছিল ওর মনে নেই। মেট্রো চলার সময় হয়ে এসেছে। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এল ও। ধীর পায়ে পৌঁছে গেল মেট্রো স্টেশন। অফিসঘরে একজনই মাত্র মানুষ। একটু ইতস্তত করে, দু-একবার 'পরে আসুন' বলেও শেষে বললেন— কী রকম খাতা?

বর্ণনা দিল ইন্দ্রাণী। কিছুক্ষণ পর একটি ডায়রির মতো বাঁধানো খাতা নিয়ে এলেন ভদ্রলোক। দেখেই হৃদস্পন্দন দ্রুত হল ইন্দ্রাণীর। ভদ্রলোক বললেন— কোনও প্রমাণ? ইন্দ্রাণী হঠাৎ, দৃঢ় গলায় বলল— দেখুন, প্রথম লাইন লেখা, কুস্তির যেমন কর্ণ...

একটি কাগজে প্রাপ্তি সই করিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। আর ডায়রিটা ব্যাগে পুরে ফিরে চলল ইন্দ্রাণী। একটি পাতাও উল্টে দেখতে ওর ইচ্ছে করল না। ওর আর তাড়া নেই। উদ্বেগ নেই।

ডায়েরিটা না পেলে ও কী করত ও জানে না। আপাতত একটাই কাজ ওর— দোতলায় একশো দুই নম্বর! চলতে চলতে হঠাৎই পুরুষ গলায় সেই ডাক শুনল ও— ইন্দ্রাণী! ও খুঁজল না। ওর আর প্রয়োজন নেই। ও চারপাশে তাকাল। বড় বড় বাড়ি। রাস্তা। বাস। ট্রাম। মানুষ— সব, সব একরকম আছে, শুধু ও নেই। ও বদলে গেছে! হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও। ‘শান্তি নীড়’-এর কথা ওর মনে পড়ল। আশ্চর্য! কাল থেকে একবারও এ কথা মনে পড়েনি কেন? ওখানে যদি লাভণ্যদি থাকেন তবে এই মহিলা লাভণ্য নন। কিংবা ধরা যাক, ও তো পরমেশ্বর বন্ধু মনোজকেও ফোন করতে পারে। যদি কোনও ভাবে এমন ঘটে যে মনোজের মা আদৌ মারা যাননি, যদি কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে? কত কিছুই তো ঘটে পৃথিবীতে! কিন্তু তার আগে নার্সিংহোমে যাওয়া দরকার। ও একা কী-ই বা করতে পারবে! ও কি পরমেশ্বর সাহায্য নেবে? না। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ও আপন মনে মাথা নাড়ে। না। বরং ও লালন ও অনিমেষকে সাহায্যের কথা বলবে। ওই দুজনকে ও চেনে না, তবু, ও জানে, যাঁরা একজন অপরিচিতা মহিলার জন্য এত কিছু করতে পারেন, তাঁরা এটুকু সাহায্য ইন্দ্রাণীকে করবেন।

নার্সিংহোমের কাছাকাছি পৌঁছে ও দেখল মি. জানার সঙ্গে কথা বলছেন চারজন— দুজন অচেনা, পরমেশ ও ছোটমেসো। পাশে, ছোটমাসি, মিষ্টিকে কাঁধ জড়িয়ে দাঁড়ানো। ওরা এখানকার খবর কী করে পেল ইন্দ্রাণী বুঝতে পারল না। হয়তো অনিমেষরাই জানিয়েছে। পরমেশকে দেখেই ওর সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে মনে পড়ার কথা ছিল না, তবু ও দেখতে পেল, জন্মদিনের পোশাকে ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে পরমেশ, ওজন নেবে। ও পরমেশের গলা জড়িয়ে আছে। আঁচলে মুখ মুছল ইন্দ্রাণী। আর কি কখনও হবে এ রকম? হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, ওকে দেখে, ছোটমাসির হাত ছাড়িয়ে ছুটে আসছে মিষ্টি। অজান্তেই দু’হাত প্রসারিত করল ও।

মূর্ছনা

www.murchona.com

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos

suman_ahm@yahoo.com

ছায়া অনুগামী

রাজা ভট্টাচার্য

বডি দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন ছোটমাসি। সাদা চাদরে মৃত্যুর গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। মুখটা যন্ত্রণায় নীল। খুব কষ্ট পেয়েছেন। মেসোমশাই ছোটমাসির কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালেন। না, আর কোনও সংশয় নেই ইন্দ্রাণীর।

শুধু চোখ দুটো জ্বালা করছিল। পুরনো অভ্যেস। অনেক সময় হয় না, কান্নাগুলো বুকের ভিতর থেকে ছিটকে ওঠে! ব্যাস, ওই পর্যন্তই। চোখ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বড্ড চোখ জ্বালা করে তখন। নিঃশ্বাস উষ্মতর ও দীর্ঘতর হয়।

সব মৃত্যুই দূরত্ব বাড়ায়। কখনও কখনও তা মানুষকে উপড়ে ফেলে শিকড় থেকে। তখন স্রোতের শ্যাওলার মতো হয় মানুষের চলন— উদ্দেশ্যহীন, ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির উর্ধ্বে। আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অনেকটা সমুদ্রমন্ত্রনের পর পুরোপুরি সমাহিত সাগর।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রাণী। সামনের পৃথিবীটায় কোনও রং নেই। কোনও স্পন্দন নেই। উত্তাপ নেই। শুধুই এক বিশাল অনুভূতিহীন টিকে থাকা। ধু ধু মাঠের মধ্যে যেমন একলা দাঁড়ায় বৃক্ষ। পার্থিব, জাগতিক সমস্ত অস্তিত্বের মাঝে নির্বিকার নিরুচ্চার এক শরীরী উপস্থিতি। উদ্ভিদের তো তবু শিকড় থাকে। ডানার সঙ্গে সমঝোতাওয়ালা শিকড়। কিন্তু তার মতো মানুষের কী থাকে— নির্বাস! কেউ জানে না, ইন্দ্রাণীর ব্যাগে ঘাপটি মেরে আছে একটা পচে যাওয়া অতীত। তার জন্মরহস্য। উনো মাটি থেকে উপড়ে নেওয়া দুনো ফসলের শিকড়। শিকড় তো নয়, শিকড়ের লাশ।

—দিদি আমার নাম লালন।

চোখ খুলল ইন্দ্রাণী।— মাসিমাকে বাইরে আনা হয়েছে, আসুন। বলে লালন রাস্তা দেখাল। বাইরে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি। আর অচেনা ওই ছেলোটা নিশ্চয় অনিমেঘ। নন্তুমামাকে কী বোঝাচ্ছে। বোধ হয় ডেথ সার্টিফিকেট। গাড়িতে তোলার আগে মৃতদেহের যৎসামান্য পরিচর্যা সারছেন ছোটমাসি। সাদা মার্কিনের আবরণের উপর ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতটা যত্ন হয়তো এই প্রথম পেলেন ভদ্রমহিলা। মেসোমশাই ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলেন। গাড়ির চালক আর লালন এগিয়ে এল। মেসো বললেন— দাঁড়ান ভাই, একটু নমস্কার....

সবাই হাত জোড় করেই সারল। ছোটমাসি শুধু কাঁদতে কাঁদতে পায়ে হাত দিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন। মেসোমশাই ডাকলেন, রানি—

ইন্দ্রাণীর আঙুলগুলো কাঁপছিল। মৃত্যুর পা দুটো টুকটুকে লাল। এখনও যেন উষা। ছুঁয়ে দেখল ইন্দ্রাণী। আজ প্রথমবার। আজ শেষবার। চোখদুটো প্রচণ্ড জ্বলছে এখনও। বুকের পাঁজরায় ধাক্কা মেরে গলা বেয়ে উঠে এল শুধু দুটো শব্দ, মা গো—

বেলা দেড়টার মধ্যে সবকিছু শেষ।
মাসি, মেসোমশাই ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রাণীর জেদ অ্যালাও করেনি। তবে অনেক কিছু ঢেকে ফেলতে হয়। তাই পরমেশ্বর সঙ্গে এক ট্যাক্সিতেই উঠতে হল। ওর সঙ্গে গত রাত্রে পর আর কথা হয়নি ইন্দ্রাণীর। ট্যাক্সিতেও হল না। রাসবিহারীর মেয়ে নেমে পরমেশ্বর একটা অন্য ট্যাক্সি ধরল। ইন্দ্রাণীকে বলে গেল— জরুরি মিটিং আছে অফিসে। যেতেই হবে। আসছি।

ইন্দ্রাণী কিছু বলল না। বলার কিছুই নেই। তা ছাড়া এখন পরমেশ্বরকে গত রাত্রে মতো দুর্বোধ্যও ঠেকছে না। পুরুষ তো, আবার মোটা মাইনের একজিকিউটিভ। বউকে ভালবাসতে পারে, বন্ধু হতে যাবে কোন দুঃখে?

ব্যাপারটা তো খুবই পরিষ্কার। বরং এখন ওর একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে। একটা আবিষ্কারের আনন্দ। হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। ধাঁধার জট খুলতে খুলতে কোনও নির্মম সরলীকরণ এক নতুন প্রাপ্তি এনেছে তার জীবনে। ছোটমাসি, মেসোমশাই, পরমেশ্বর, এই চারপাশ— সবাই, সব কিছুই খুব স্বাভাবিক লাগছে এখন।

অস্বাভাবিক শুধু মিষ্টি। ওইটুকুন মেয়ে সকাল থেকেই কেমন থম্ মেয়ে গেছে। কিছু খেতে চায়নি, খায়নি। এ সব কেসে ছোটদের আনা একেবারেই উচিত নয়। জীবনের শুরুতেই শেষের ছবিটা মনে গেঁথে দেওয়া হল জোর করে।

একটু পরেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ইন্দ্রাণী। মিষ্টিকে কিছু খাওয়াতে হবে। তারও বেশ খিদে খিদে পাচ্ছে। শোক ব্যাপারটাই বোধহয় এ রকম। বানের জল নেমে যাবার পর শরণার্থী মানুষ যেমন মরা স্রোতে ভাসতে ভাসতে বুঝতে পারে পৃথিবীতে শুধু শরীরটাই অস্তিত্ব। বেঁচে থাকাটাই সার। মরে গেলে বোধহয় আর কিছুই থাকে না। পাশাপাশি, জীবন কিন্তু থেমে থাকে না। থেমে নেই। ইন্দ্রাণী অনেকটা শান্ত। কারও প্রতি কোনও অভিমান নেই। জিজ্ঞাসাও নেই। ঘাড়ে চেপে বসা একটা উটকো মৃত্যু-রহস্যের কাদা ঘাঁটতে যাবে না সে, মগজের গভীরে কোথায় যেন চোখ মেলে জাগছে এক বোধ। হাঁটতে বেশ ভাল লাগছে ওর।

খাওয়াদাওয়ার পর মিষ্টিকে একটা আইসক্রিম-কোন কিনি দিয়েছে মা। দুজনের কারও আজ বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। হাঁটতে হাঁটতে দেশপ্রিয় পার্ক চলে এসেছে। ইন্দ্রাণী বলল— মিঠাই, চল পার্কে বসি। আইসক্রিমের বোলমাখা পুচকি ডান হাতটা চাটতে চাটতে মিঠাই গলে গেল রিভলভিং গোট দিয়ে। ইন্দ্রাণী ওর পিছন পিছন। এখন সাড়ে তিনটে বাজে। বেশ চড়া রোদ। এখনও তেমন ভিড় হয়নি। দূরে কয়েকটা কিশোর ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করছে। ওরা ছায়া দেখে বসল। এ জায়গাটাতেই ঘাস একটু ঘন। অনেকক্ষণ পরে একটু বিশ্রাম। ঠাণ্ডা ঘাসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল ইন্দ্রাণীর। জুতো খুলে পা দুটো আরামে ছড়িয়ে দিল ঘাসে। মিষ্টি বসল কোলের কাছে। হাতের আলতো ছোঁয়ায় মা মেয়ের ছোট মাথাটা টেনে নিল কোলে।



— ও মাসি, বাদাম নেবে? কানের কাছে পিনপিন করে উঠল একটা অসহ্য উচ্চারণ। কোথাও শান্তিতে একটু বসবার জো নেই। ইন্দ্রাণী চোখ তুলে দেখল বছর পনেরো-ষোলোর একটা মেয়ে। শীর্ণা বললেও বেশি বলা হয়। ময়লা, ফাটা একটা চুড়িদার। ছেঁড়া হাওয়াই। বিয়ের বয়স তো হয়নি। তবু কেন অযত্নের চুলের জটায় উঁকি মারে সিঁদুর? লোহার ব্যাকাটারা তারের রিং থেকে ঝুলছে চানাচুর, বাদামের প্যাকেট। এইটুকু বইতেই নুয়ে পড়েছে মেয়েটা। প্যাকাটিপানা হাতে ময়লা শাঁখাই ভারী। মায়া হল ইন্দ্রাণীর। বলল— কত করে?

— পাঁচ টাকা প্যাকেট। ইন্দ্রাণী বুঝল পরিমাণ আন্দাজে দামটা বেশিই।
— লেবে মাসি? মেয়েটা কাতর। ইন্দ্রাণী দেখল, মেয়েটার পেটটা অস্বাভাবিক। ওইটুকু ছুঁড়ি! কেমন বিচ্ছিরি একটা চিন্তায় গা-টা রিনরিন করে উঠল ওর।
— কোথায় থাকো?
— আগে ছিলাম সেই লেকগাডেনের বস্তিতে। একল কোথাও না।
— মানে? তোমার কেউ নেই?
— না। কটা দোবো?

ইন্দ্রাণী দুটো পাঁচ টাকার কয়েন বের করে দিল। মেয়েটা রিং থেকে দুটো প্যাকেট ছিঁড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আচমকা ইন্দ্রাণীর মাথায় খুন চেপে গেল।

— তোমার স্বামী নেই?
মেয়েটা চুপ। ইন্দ্রাণীর গলা চড়ে যাচ্ছে উত্তেজনায়।
— তা হলে সিঁদুর পরো কেন?
— কী করব মাসি? পেটে বাচ্চাটা এসে গেল। সিঁদুর না পল্লে শালা শেয়াল কুকুরে...

এতক্ষণে ইন্দ্রাণীর পারদ চড়ে গেছে অনেকটা। মাথার মধ্যে আগুন লেগে যাচ্ছে। মেয়েটা কিন্তু বলেই চলেছে।

— কেলাস্ ফোর অব্দি পড়েছি মাসি। বাপটা রোজ রাতে সাটা খেলে প্যাকেট খেয়ে এসে মাকে ক্যালাত। একদিন মারের ভয়ে পালাতে গিয়ে মাটা লাইনে কাটা পল্লে। কদিন বাদে মুকে রক্ত তুলে বাপটাও মরে গেল। আমি নোকের বাড়ি—

ইন্দ্রাণী হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর। চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে ক্রমাগত থাপ্পড় মারতে লাগল। রুগ্ণ মেয়েটা ককিয়ে উঠল। ঘাবড়েও গেল মারাত্মক। ইন্দ্রাণীর কোনও হুঁশ নেই। পাগলের মতো মেয়েটার গলা টিপে ধরেছে। আর চিৎকার করছে—

বল, কোথায় মরতে গিয়েছিলি?

লোক জমে গেছে। বেশির ভাগই সমাজের নিচুতলার মানুষ, যারা দুপুরে জিরোতে আসে পার্কে। মহিলা বলে কেউ এগোতে সাহস পাচ্ছে না। একজন চিৎকার করে থামাবার চেষ্টা করল— কী করছেন দিদি? আরে, মেয়েটা তো মরে যাবে। পার্কের রেলিং ঘেঁষে একটা টিপকল। কোনও ফ্ল্যাটবাড়ির মাঝবয়সি পরিচারিকা জল নিতে এসেছিল। রেলিং টপকে এসে গায়ের জোরে আলাদা করল ওদের। পোয়াতি মেয়েটা প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে। সমবেত দর্শকমণ্ডলীর ঘেন্না টুকরো টুকরো ছিটকে আসছে ইন্দ্রাণীর গায়ে। গরিবের ওপর বড়লোকদের অত্যাচারের নতুন ফর্মা আবিষ্কৃত ভেবে ইতস্তত জ্বলে উঠছে রুখাশুখা জিভ। অসংযম অনর্গল। চানচুর, বাদামের প্যাকেটগুলো ছিঁড়ে-ছিড়িয়ে গেছে। কয়েকজন মেয়েটাকে দূরে নিয়ে গিয়ে মুখে চোখে জল দিচ্ছে। এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি ইন্দ্রাণী। ওর হাত-পা কাঁপছে থরথর করে। চুল খুলে গেছে। সারা গায়ে ঘাম, অস্থিরতা। চোখ বিস্ফারিত। ওই পরিচারিকা গোছের মহিলা আর কয়েকজন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। হাতে পায়ে যেন সাড় নেই ইন্দ্রাণীর। দেখতে পাচ্ছে একটা ভিখারির বাচ্চা ছড়িয়ে যাওয়া বাদামের প্যাকেটগুলো সরিয়ে নিচ্ছে। ন্যায়-অন্যায় বোধটা যেন একটু একটু করে কাজ কর তে শুরু করেছে মগজে। ও জানে ওর নিস্তার নেই। বাদামের দাম দিয়ে পার পাবে না। তাতে বরঞ্চ ওদের অপমানটা আরও বাড়িয়ে তোলা হবে। ইন্দ্রাণী জানে না কেন এ রকম করল। ও তো কোনও দিন এতটা হিংস্র হয়নি। শিরদাঁড়াটা যেন দুমড়ে যাচ্ছে ওর। পেটের ভিতর নাড়িভুঁড়ি ঠেলে উঠছে গরম লাভা। আর তাতে গুলে যাচ্ছে পরমেশ্বরের অবিশ্বাস, মাসি-মেসোর রাংতায় মোড়া ভালবাসা, হঠাৎ আলাদা হয়ে যাবার ভয়, নিজের অবাঞ্ছিত জন্মের অপমান— সব, সব— যা যা নাক টিপে গিলে এসেছে এ পর্যন্ত। শিরায় শিরায় আন্দোলন শুরু হল। জানে না, ও কিছু জানে না। ভয়ঙ্কর এক আবেগে দেহটা মুচড়ে গেল ওর। আন্দোলনটা শিরাজাল বেয়ে বেয়ে চলে আসছে বুকে। ও দেখতে পাচ্ছে লোক দুটো আরও এগিয়ে আসছে। ওর মাথার দু' পাশটা ফেটে যাচ্ছে। দু' হাতে মাথা খা মচে ধরে সর্বশক্তি দিয়ে তীব্র এক চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রাণী।

কোনও জাগতিক চিৎকারে তুলনা মিলবে না তার। বর্ণমালার কোনও শব্দই ছিল না তাতে। ক্রোধের সেই বিবর্ণ দ্রবণে ছিল স্ফোভের বাষ্প, ঘৃণার নির্যাস, বিষাদের বিষ। ওর পৃথিবীর প্রথম আত্ননাদ।

পায়ের তলার মাটি সরে সরে যাচ্ছে ইন্দ্রাণীর। টলতে টলতে উবু হয়ে বসে পড়ল ও। শরীরটা যেন ভেঙে আসছে। সাপ বিষ ছাড়লে যেমন হয়, নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

লোকগুলো আর এগোয়নি। হয়তো পাগল ভেবেছে। মিষ্টি ভয়ে কেঁদে ফেলেছে। মা ওকে কোনও দিন মারধর করেনি। ওই মেয়েটা নিশ্চয় বড় কোনও দুষ্টুমি করেছিল। মার কাছে যেতেই এখন ভয় করছে। এ দিকে চারদিক যেন থমকে আছে। অন্ধকার অন্ধকার। সন্ধে হয়ে এল নাকি? মাকে ছেড়েও খুব ভয় করছে মিষ্টির। পায়ে পায়ে মার কোল ঘেঁষে এগিয়ে এল।

মেঘটা বেশ গাঢ় হয়ে আসছে আকাশে। অগস্ট মাসের বিকেল পাঁচটা। এতটা অন্ধকার হবার কথা নয়। আশেপাশের দোকানের আলো জ্বলে উঠছে পটাপট। পার্কে সত্যিই বেশ অন্ধকার। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। শিরশিরিয়ে উঠল ঘামে ভেজা নাগরিক শরীরেরা। যারা পার্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, আশ্তে আশ্তে উঠে গেল।

প্রকাণ্ড এক ঘন কালো মেঘের নীচে মা আর মেয়ে, একা। পাশাপাশি। নিশ্চুপ।

অযত্নের সবুজায়ন নেড়েচেড়ে হালকা একটা ধুলোঝড় উঠল পার্কে। বাচ্চাটা চোখে-মুখে হাত দিয়ে বাঁচল। ক-ড়া-ত করে একখানা মারাত্মক বাজ। মিষ্টি ভয়ে জাপটে ধরল মাকে। চমকে উঠল ইন্দ্রাণী। বাচ্চারাও এমনভাবে ছুঁতে পারে— এতটা বন্ধুত্ব, এতটা বিশ্বাস!

টুপটাপ করে বেশ ভারী ফোঁটাগুলো পড়তে শুরু করল ইন্দ্রাণীর গায়ে-মাথায়-আঁচলে। মিষ্টিকে বুকে জড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল সে। পৃথিবীর কান্না আজ ধুইয়ে দিতে আসছে ওকে। আহ! এমনটাই যেন চেয়েছিল সে। আজ সব হিসেব চুকেবুকে যাক। অনেক অনেক দিনের হিসেব। সেই ছোটবেলা থেকে চোখ জ্বালা করার হিসেব, খোলামকুচি জীবনকে সোনার গুঁড়োয় বলসে দেবার হিসেব, আজন্ম একই গোলকধাঁধায় তৃপ্ত থাকার হিসেব। আঁজলা ভরে ভরে আজ দাম মিটিয়ে নিতে হবে। শহরের সাজঘর তছনছ হয়ে যাবে আজ বেনোজলে। আর সোহাগের ভেলা ভেসে যাবে কান্নায়।

হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী কাঁদছে। হাউ হাউ করে কাঁদছে মিষ্টিকে জড়িয়ে ধরে। আজ প্রথমবার কান্নাগুলো পাঁজরার আগল ভেঙে বুক থেকে চোখে উঠে আসছে। সে কথা জানে শুধু চর। চর আর ইন্দ্রাণী। আর জানে ছোট্ট একটা শৈশব। মায়ের বুকে কান পেতে সে কি শুনতে পাচ্ছে কান্না ওঠার শব্দ? তার ছোট্ট মুখখানাও যে ধুয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিতে আর কান্নায়।

সাড়ে এগারোটা। পরমেশ খবর না দিয়ে কখনও এত রাত করেনি। মিষ্টি ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ, খুব ভিজছে বাচ্চাটা। ভাগ্যিস ইন্দ্রাণী বুদ্ধি করে হাফ প্যারাসিটামল খাইয়ে দিয়েছে। তার নিজেরও সমস্ত শরীর ভার। মাথা নাড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। ঘুম এলেও ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। পরমেশ হয়তো আর আসবে না। নয়তো সেপারেশন চাইবে। পরিচিত সুখবোধের ছবিটা ফুটো-ফুটো হয়ে যাচ্ছে। একটা হাঁদুর কুটকুট করে কেটে চলেছে সব বাঁধন। শিকে ছিঁড়ে চুপিসাড়ে একে একে খসে যাচ্ছে ওর প্রেম, দাম্পত্য, সংসার— হোম, সুইট হোম; সব পেয়েছির আসর— স্বাস্থ্যকর ব্যাকিং, ফ্রিজের মধ্যে সিঁটিয়ে থাকা প্রোটিন, সংস্কৃত ড্রয়িং রুম, নিয়মনিষ্ঠ বিছানা— সীমাহীন সুখের স্বয়ংক্রিয় শিল্পাঞ্চল।

কেন সব কিছুকেই ভুল নামে ডাকে মানুষ, লাফিং বুদ্ধের মতো? ইন্দ্রাণী জানে, আসলে ওটা লাফিং বুড্‌টা। মানে হাস্যরত বুদ্ধ। সমৃদ্ধির বস্তুবাদের সঙ্গে সিদ্ধার্থের সাধনা কত সহজেই মিশিয়ে ফেলেছে মানুষ। তা ছাড়া, বুদ্ধদেব কবে এ রকম বিকট মোটা ছিলেন আর কবেই বা অমন করে দেঁতো মুশকিল আসান হাসিটি হেসেছিলেন, ইতিহাস বলতে পারে না। এভাবেই একদিন হয়তো তামাম দুনিয়ার সমস্ত সত্যিগুলো চটকদার হয়ে যাবে যাবতীয় উন্নততর সত্যির রঙে।

বিছানায় আধশোওয়া হয়ে বসে সারা রাত জেগে আছে ইন্দ্রাণী। ওর সামনে এখন একটাই সত্যি, রংচঙে নয়, সত্যিই সত্যি, ওর সন্তান। অবাস্তিত নয়, পরম যত্নের।

শহরের ঘা-ভরা বাপসা আকাশে একটু একটু করে আলো ফুটে উঠছে। ঘুমন্ত সন্তানের নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন একটা লড়াইয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছে ইন্দ্রাণী।

পরমেশ ফেরেনি।



For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>
suman_ahm@yahoo.com